বনজ্যোৎস্না

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরাক্রমের পরিণাম

তার নাম পরাক্রম সিংহ।

নামটা যত' জাঁকালো, লোকটা ছিল' তার উল্টো। রোগা টিংটিঙে, ক্ষয়া মতন ছোট্ট লোকটি। বুদ্ধি বিদ্যাও বিশেষ কিছু ভগবান্ তাকে ন নি, নিজেও সে অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু এক বিষয়ে তার রাক্রম ছিল' সিংহের মতন—তার কণ্ঠস্বর ছিল' দরাজ ও গম্ভীর, া অনর্গল ব'কে যেতে পারত'। তার দৈহিক স্থূল অস্তিত্বের অভাব গবান্ পূরণ ক'রে দিয়েছিলেন তার শাব্দিক শক্তির দ্বারা—তার স্তিত্ব ছিল' বাঙ্ময়। একে দেখেই বোধ হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ াখেছিলেন—

অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব দেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এত' টুকু যন্ত্র হ'তে এত' শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়!

বন-জ্যোৎস্না

পরাক্রম স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বক্তৃতা দেওয়ার আর্ট্‌টা আয়ত্ত করার সাধনা ক'রে এসেছে। বিধাতৃদত্ত শক্তিকে ও অশিক্ষিত-পটুত্বকে সে সাধনার দ্বারা প্রবল ক'রে তুলেছিল'। সে কল্‌কাতায় যখন কলেজে পড়ে তখন কোনো সভা-সমিতির সংবাদ পেলে হ'লো, পরাক্রম ঠিক সকলের আগে গিয়ে প্রথম বেঞ্চে সমাসীন আছে দেখা যেত'। সুরেন বাঁড়ুজ্জে, বিপিন পাল, এনি বেসাণ্ট্‌, আনন্দমোহন বসু, কালীচরণ বাঁড়ুজ্জে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাগ্মীদের বক্তৃতা সে পান ক'রে আস্‌ত, এবং তাঁদের ব্যবহৃত বাক্যাবলী বাক্‌ভঙ্গী প্রকাশ-কৌশল মুখস্থ ক'রে নিয়ে সেই রাত্রেই গড়ের মাঠের এক নির্জন অংশে গিয়ে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা আয়ত্ত করত'। সে যে-মেসে থাকৃত' সেই মেসের ছেলেরা গভীর রাত্রে ছাদের উপর পরাক্রমের গম্ভীর গর্জন ও হুঙ্কার শুনে মাঝে মাঝে জেগে উঠ্‌ত', আর পাড়ার লোকেরা পরদিন প্রভাতে এসে মেসের ছেলেদের উপর তর্জন কর্‌ত'—"কী ব্যাপার মশায়, আপনাদের চীৎকারের চোটে রাত্রে একটু ঘুমোবার জো নেই!" দু চারবার ওয়ার্নিং পাওয়ার পর পরাক্রমের মেস বদ্‌লাতে হত'।

বক্তৃতা যে পরিমাণে মুখস্থ হলো, পরাক্রমের পাঠ্য পুস্তকের বিষয়-গুলি সে পরিমাণে মুখস্থ হলো না। ফল হ'লো বি-এ পরীক্ষায় ফেল হওয়া। ইতিমধ্যে পরাক্রমের প্রতি মা-ষষ্ঠির কৃপা-কটাক্ষ পুনঃ পুনঃ নিপতিত হওয়াতে তার গৃহ চারটি ক্ষুধিত শিশুর ক্রন্দন-কোলাহলে সরগরম হয়ে উঠেছিল'; পরাক্রমের গুরুগর্জনে সেই কোলাহল বেড়ে

যায় বই কমে না। যাতে ক্রন্দন থামতে পারে তার নিতান্তই টানা-টানি। কাজেই সন্তান-প্রসব-শ্রান্তা স্ত্রীর মুখ-ঝাম্‌টা খেয়ে পরাক্রম চাকরীর চেষ্টায় পায়ের ধূলা মাথায় তুলে ও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আফিসে আফিসে চাকরীর সুপারিস নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল'।

অনেক অপমান সহ্য করার পর পোর্ট-কমিশনার অফিসের এক জেটি সরকারের কাজ জোগাড় হ'লো—মাইনে মাত্র পনেরো টাকা। কিন্তু আফিসের বড়'-বাবু তাকে চুপিচুপি বল্‌লেন—মাইনে শুনে [illegible]কো না, উপ্‌রি আছে; এর পরে বল্‌বে মাইনে বিনাই কাজ কর্‌ব। প'ড়ে উপরির বখ্‌রা আধা-আধি!

অনন্তর বড়'-বাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় পরাক্রম পরম উৎসাহে উপ্‌রি পাওনা [illegible]য় লেগে গেল'। বড়-বাবুকে আধা-আধি দিলে তার আর [illegible]! কাজেই তাকে আদায় কর্‌তে হয় একটু ক'ষে আর [illegible] খবর পাওনা[illegible] রাখ্‌তে হয় একটু চেপে। তাতে [illegible] বিপুল ভুঁড়ির এক কোণে যেন' একটু খালি-খালি ঠেকে, [illegible] মধ্যে সন্দেহ ভুড়ভুড়ি কাটে।

[illegible]দিন বড়'-বাবু তাকে স্পষ্ট ব'লে ফেল্‌লেন—দেখ' হে পরাক্রম, [illegible] চাকরী দিয়েছি যে শর্তে সেটা মনে রেখো—নিমকহারামী [illegible] বেশী দিন টিকৃতে পার্‌বে না।

[illegible]ংটিঙে দেহযষ্টিকে নুইয়ে হাত জোড় ক'রে পরাক্রম গর্জন [illegible]

একদিন পরাক্রমের কাছা বড় বেয়াড়া রকমে বে-ইমানী ক'রে বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌লে; পরাক্রম যখন বড়'-বাবুর কাছে দৈনিক উপ্‌রি পাওনার অর্ধেক ব'লে সিকির সিকি বুঝিয়ে দিতে এসেছে, ঠিক সেই অসময়ে পরাক্রমের কাছায় বাঁধা টাকার আল্যা গেরো খুলে গেল, আর টাকা সিকি দুআনি আনি সব তার দু পায়ের আচ্ছাদন কাপড়ের তল দিয়ে গড়িয়ে এসে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়্‌ল'। পরাক্রমের এত' দিনের প্রতারণা একেবারে ব-মাল হাতে হাতে ধরা প'ড়ে গেল। বড়'-বাবু রক্তচক্ষু! তিনি হুঙ্কার ক'রে শুধু বল্‌লেন—হুঁ!

পরাক্রম একেই এত'টুকু মানুষ, তার উপর এই হাতে-নোতে ধরা প'ড়ে গিয়ে ভয়ে লজ্জায় আরো এত'টুকু হয়ে গেল'। সে ছড়িয়ে পড়া অনর্থের কারণ সব কটি অর্থ কুড়িয়ে তুলে বড়'-বাবুর টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে স'রে পড়্‌ছিল'। বড়'-বাবু গর্জন ক'রে বল্‌লেন—হরক সিং, দেখ্‌লেও তো আউর কঁহী কুছ্‌ ছিপাকে রাখ্‌খা হৈ কি নেই।

শিখ দ্বারবান্‌ হরক সিং প্রভুর হুকুম তামিল কর্‌তে এল'। পরাক্রমের তখন মনে হচ্ছিল "হে ধরণী দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবেশ ক'রে অপমানের লজ্জা গোপন করি।"

পরাক্রমের দেশলাইর বাক্‌স থেকে বেরুল' একটা অচল সিকি, আর পানের ডিবে থেকে একটা ঘসা আনী। সে দুটিও বড়'-বাবুর হিস্‌সায় বাজেয়াপ্ত হ'লো।

বড়'-বাবু বল্লেন—তুমি অনেক দিন ঠকিয়েছ'। তুমি রোজ ছুটির

পর এখানে আস্‌বে, হরক সিং তোমার কাপড় ঝাড়া দিয়ে দেখ্‌বে, আর যত দিন তুমি আমাকে ঠকিয়েছ' তত'দিন তোমার সব পাওনা আমাকে দিয়ে যেতে হবে।

পরের দিন থেকে পরাক্রম ভয়ানক ধার্মিক লোক হয়ে পড়্‌ল'। সে ঘুষ নেওয়া একদম ছেড়ে দিলে। মাল দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে কেউ কিছু পুরস্কার দিতে চাইলেও পরাক্রম তা কিছুতেই নেয় না, সে জিব কেটে বলে—আরে রামো রামো! ঘুষ কি আমি নিতে পারি? আর সে মনে ভাবে—পরের জন্যে হাত ময়লা ক'রে লাভ কি?

পরাক্রমের পকেট ট্যাঁক কাছা কোঁচা তল্লাস ক'রেও একটা পয়সা বেরোয় না। বড়'-বাবুর মেজাজ উত্তরোত্তর উত্তপ্ততর হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল'। আগে তবু দিন গেলে দু-পাঁচ টাকা পাওয়া যেত', এখন যে একেবারে সেরেফ্ ফাঁকি?

বড়-বাবুর হুকুম হ'ল—তুমি টাকা পাও না পাও আমি জানি না। আমাকে রোজ তিন টাকা ক'রে তোমায় দিতে হবে।

পরাক্রম মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—পাই মোটে পনেরো টাকা মাইনে, মাসে একশো টাকা আপনাকে দেবো কোথা থেকে?

বড়'-বাবু হুঙ্কার ক'রে বল্‌লেন—ন্যাকা? ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না?

পরাক্রমের এই নিত্য লাঞ্ছনা আর সহ্য হচ্ছিল' না। সাধুবৃত্তি আর সততায় জোটে মোটে পনেরো টাকা, তাতে পেট ভরে না; আর

ঘুষই যদি খায় তবে তারও থেকে মাসে একশো টাকা দিয়ে বাকী আর থাকে কি?

পরাক্রম আন্‌মনা হয়ে বাসায় চলেছে। গোলদিঘীতে দেখ্‌লে জনতা। কে একজন কেরোসিনের বাক্‌সের উপর চ'ড়ে বক্তৃতা করছে। পরাক্রমের বক্তৃতা শোন্‌বার সখ্‌ জেগে উঠ্‌ল'।

পরাক্রম দাঁড়িয়ে শুন্‌লে একজন ছোকরা মিন্‌মিনে গলায়, অসচ্ছল ভাষায় গ্যাঁ-গোঁ ক'রে বক্তৃতা ক'রে শ্রোতাদের স্বদেশহিতের জন্য আত্মোৎসর্গ কর্‌তে উৎসাহিত কর্‌তে চাচ্ছে, বিদেশীদের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নন্‌-কো-অপারেশন কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ছে। তার বক্তৃতা শেষ হ'তে না হ'তেই আর এক ছোকরা বাক্‌সের উপর ঠেলে উঠ্‌ল' এবং মৃগী রোগীর মতন হাত-পা ছুড়ে মিহি গলায় চেঁচাতে লাগ্‌ল'—"ভাই-সব, উঠো, জাগো, প্রাণ দাও, প্রাণ দাও!" সে নাম্‌তেই আর একজন উঠ্‌ল'—হিন্দু-মুসলমান এক দেশ-মায়ের যমজ ছেলে—আমরা সব ভাই ভাই, হিন্দু-মুসলমান ভারতমাতার দুই চক্ষু, আমাদের যা-কিছু সম্পত্তি আছে তার অর্ধেকের ন্যায্য অংশীদার মুসলমান!

বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে পরাক্রমের দ'মে যাওয়া মনটা গরম আর চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল'। সেও লাফ দিয়ে কাঠের বাক্‌স অধিকার ক'রে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিলে এবং এত দিনের মুখস্থ বুলিগুলো আজ তার বিশেষ কাজে লেগে গেল'। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে ঘন ঘন হাততালি আর হীয়ার হীয়ার শব্দ উত্থিত হয়ে পরাক্রমের মাথা ঘুরিয়ে দিলে।

পরাক্রম ব'লে উঠ্‌ল—কথার চেয়ে দৃষ্টান্তের দাম ঢের বেশী। আমি পোর্ট্‌-কমিশনার আফিসে চাকরী করি। বিদেশীর দাসত্ব এই আমি ত্যাগ করলাম, বিদেশীর সংস্রব হিন্দুর গোরক্ত, মুসলমানের শূকর-রক্ত। বর্জন করো যা কিছু বিদেশী ... ...

এই ব'লেই পরাক্রম তার গায়ের ছেঁড়া চাদর ও কোটটা খুলে ফেল্‌লে এবং নিজেরই দেশলাই জ্বেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে? অমনি চারিদিক থেকে বন্দে মাতরম্‌ আর আল্লা-হো আকবর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্ত্রমেধ যজ্ঞে আহুতি পড়্‌তে লাগ্‌ল' জামা চাদর রুমাল পাগ্‌ড়ী টুপী। শ্রোতা ও দর্শকদের মনেও উৎসাহের আগুন লেগে গেল'।

রাখে কৃষ্ট মারে কে? কংগ্রেস-ভলান্টিয়াররা পরাক্রমকে চ্যাংদোলা ক'রে কাঁধে তুলে কলরব করতে করতে কংগ্রেস আফিসে নিয়ে গিয়ে হাজির? এমন সর্বত্যাগী স্বদেশহিতৈষী সুবক্তাই তো দেশের দুর্দিনে দরকার, পলিটীক্যাল-নেতারা তো এমনি একজনকে খুঁজ্‌ছিল'। পরাক্রম আপাততঃ এক শো টাকা ক'রে পাবে, আর তাকে প্রত্যহ ওজস্বিনী ভাষায় দেশের লোককে মাতিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে।

খুশী মনে বাসায় ফিরে যেতে যেতে পরাক্রম ভাবছিল'—যা-[illegible] চাকরীটাকে উড়ো-খৈ গোবিন্দায় নমঃ ক'রে দিয়ে ক্যা চালই চালা হয়ে গেল'! ভাগ্যিস বক্তৃতা দেওয়াটা রপ্ত ক'রে রেখেছিলাম, এখন কাজে লাগ্‌ল'। সাধে কি কথায় বলে—যাকে রাখো সেই রাখে?

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে পরাক্রমের মনে হ'লো—পোর্ট-কমিশনারের কুলিগুলোকে ক্ষেপিয়ে একটা পঞ্চায়েৎ ক'রে ধর্মঘট করালে তোফা হবে? আমি হবো তাদের ট্রেট-ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট্, লেবার-লীডার! ষ্ট্রাইক! ষ্ট্রাইক!

পরাক্রমের তখন বোধ হয় বৃহস্পতির দশা পড়েছিল। সে যে সঙ্কল্প কর্‌লে সেই সঙ্কল্প তার যাতুকরের পোঁতা আমের আঁঠির মতন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠ্‌ল। পরাক্রমের বক্তৃতার চোটে জেগে উঠ্‌ল ধর্মঘট, স্থাপিত হ'লো শ্রমিকসঙ্ঘ, পরাক্রম হ'লো শ্রমিক-সঙ্ঘপতি এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাজার আড়াই টাকা চাঁদা উঠে পরাক্রমের হাতে এসে পড়্‌ল।

একদিন কুলিগুলো পোর্ট-কমিশনার আফিসের সাম্‌নে হট্টগোল ক'রে অল্প সময় কাজ ক'রে অধিক মজুরী দাবী কর্‌ছিল, এমন সময় বেরিয়ে এল বড়বাবু সাহেবের হুকুমে কুলিদের সমৃঝাতে। বড়-বাবুকে দেখেই পরাক্রমের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। সে বেঁটে ছোট্ট মানুষ, ভিড়ের মধ্যে ডুবে ছিল; সে টপাক ক'রে লাফ দিয়ে একজন জোয়ান কুলির কাঁধের উপর চ'ড়ে ব'সে চেঁচাতে লাগ্‌ল—ভাই সব, দোস্ত্ সব, ঐ পেট মোটা বেঁটে বাঁটুকুল লোকটার কুমন্ত্রণা শুনো না! আমাদের অন্ন মেরে ওর পেট মোটা হয়ে উঠেছে!.........

যাঁহাতক এই কথা বলা অমনি হাজারো কুলি রুখে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—মারো ঐ দুষ্‌মন শয়তানকো।

৷ ন-জ্যোৎস্না

বল্‌তে না ফল্‌তে ? বিদ্যুৎসঞ্চারের মতন এই ইচ্ছা একজনের মন থেকে মুখ দিয়ে বিরিয়ে বাতাসে মিশ্‌তে না মিশ্‌তে বড়-বাবুর কাছে যে কুলি ছিল তার হাত বোঁ ক'রে ছিট্‌কে গিয়ে লাগ্‌ল বড়-বাবুর ভুঁড়িতে, বড়-বাবু গড়িয়ে পড়্‌লেন ভূমিতে, এবং মার মার শব্দে চারিদিক থেকে ইট পাট্‌কেল কাঠ লোহা যে যা হাতের কাছে পেলে আফিসের উদ্দেশে প্রেরণ করতে লাগ্‌ল—ঝনঝন ঝনঝন শব্দে জান্‌লার সার্সিগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

পুলিস আগেই আফিস থেকে টেলিফোনে খবর পেয়েছিল—এক লরী পুলিস আর একদল ফায়ার-ব্রিগেড এসে হাজির হলো। ফায়ার ব্রিগেড রাস্তার হাইড্রাণ্টে হোজ লাগিয়ে দমকল ছেড়ে দিলে তোড়ে জলের ফোয়ারা ভিড়ের উপর এবং জল-প্লাবনে নাকানি-চোবানি খেয়ে পলাতক কুলিদের ক্যাঁক ক্যাঁক ক'রে গেরেপ্তার ও লরী বোঝাই করতে লাগ্‌ল পুলিস। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জনতা সাফ। সব সট্‌কেছে—ধরা পড়েছে জন পঞ্চাশেক কুলি আর ধর্মঘটের সর্দার পরাক্রম।

বড়বাবু বেচারা মাথায় একটু জখম হয়ে আর গায়ে কাদা মেখেই অব্যাহতি পেয়ে গেল—তাকে পুলিস ধরাধরি ক'রে তুলে ট্যাক্সি ডেকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে।

কাগজে কাগজে নাম বেরিয়ে গেল পরাক্রমের! কংগ্রেস-কর্তারা জামিন হ'তে চাইলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন না-মঞ্জুর করলেন। পরাক্রম

রইল হাজতে ; তারপর দিন পনেরো হাজত আর আদালত গতায়াত ক'রে গেল ছ' মাসের জন্যে জেলে ?

যেদিন সে জেল থেকে বেরিয়ে এল সেদিন তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্যে জেলখানার সাম্‌নে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাজার খানেক স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়ে আর কুলি মজুর। পরাক্রমের কোল-কুঁজো সরু বুকও সিকি ইঞ্চি ফুলে উঠ্‌ল আহ্লাদে গর্বে ? ফুলের মালা গলায় দিতে দিতে পরাক্রমের সরু লিকলিকে গলাটা সাম্‌নে নুয়ে পড়্‌ল, ছোট্ট বেলের মত মাথাটা মালার স্তূপে তলিয়ে গেল, তার টিংটিঙে ঠ্যাং দুটো মালার ভার আর বইতে পারে না। অমনি কয়েকজন জোয়ান ছোক্‌রা পরাক্রমকে চ্যাং দোলা করে কাঁধে তুলে "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে ফেল্‌লে এবং তাকে ফুল-দিয়ে-সাজানো মোটর গাড়ীতে খাড়া ক'রে দিয়ে বরের মতন, বিজয়ী বীরের মতন, শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে গেল কংগ্রেস আফিসে।

সেই দিন থেকে পরাক্রমের প্রতিষ্ঠা শতগুণ বেড়ে গেল। সব মিটিঙের প্রধান বক্তা পরাক্রম ? মফস্বলে পরের খরচে স্বচ্ছন্দে খেয়ে-দেয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে লোককে উদ্বুদ্ধ ক'রে বেড়ায় পরাক্রম।

এমন সময় হ'লো সিলেট-কাছারে বন্যা। পরাক্রমের প্রাণ পরের দুঃখে আছাড় খেয়ে পড়্‌ল। সে তার পাড়ার কতকগুলো নিষ্কর্মা ছেলেদের জুটিয়ে বল্‌লে—তোমরা চলো বাণভাসীদের জন্যে কিছু

ভিক্ষা ক'রে আনি। তোমাদের পেট ভরে বিড়ি আর জিলিপি খাওয়াব।

অমনি ছোকরারা উৎসাহিত হয়ে দুটো বাঁশের সঙ্গে এক টুকরা শালু কাপড় বেঁধে নিশান করলে আর শালুর উপর তুলো দিয়ে লিখ্‌লে—দরিদ্রান্ ভর! তারপর একখানা গেরুয়া রঙে ছোবানো কাপড়ের চার কোণে চার জন ধ'রে দল বেঁধে পথে বেড়িয়ে পড়লো; একজন কুলির পিঠে একটা হারমোনিয়াম বাঁধা; তার পিছনে পিছনে চল্‌তে চল্‌তে একজন সেই হারমোনিমটা বাজাচ্ছে আর তার সঙ্গে বেসুরে বেতালে সকলে মিলে চেঁচাচ্ছে—

ওগো ভিক্ষা দাও ওগো পুরবাসী,
কাতরে কাঁদিছে কত উপবাসী।
নদী জলে ভেসে ছেড়ে বাড়ী ঘর, আঁখিজলে ভাসে ক্ষীণ কলেবর,
তোমাদেরি ভাই-বোন স্বদেশবাসী।

গানটি স্বয়ং পরাক্রমের রচনা। সেও তার কর্কশ স্বরে এই গান গাইতে গাইতে দলপতি হয়ে সর্বাগ্রে চলেছে।

বাড়ী থেকে রওনা হবার সময়ই পরাক্রম ভিক্ষার ঝুলি গেরুয়া কাপড়ের উপর তার মেয়ের একটা মাকড়ি, একগাছা চুড়ি, একটা বালা, একখানা দশ টাকার নোট, একখানা পাঁচ টাকার নোট, গোটা পাঁচেক টাকা, আর টাকা পাঁচেকের রেজ্‌কী আর পয়সা ছড়িয়ে দিয়েছিল।

পথে যারা দেখ্‌ছে যে এত রকমের দান সংগৃহীত হয়েছে, তারাই দয়াপরবশ হ'য়ে সেই কাপড়ের উপর কিছু না কিছু দান করছে।

ঘণ্টা কতক পথে পথে চীৎকার ক'রে যখন পরাক্রম বাসায় ফিরল তখন চাল টাকা পয়সা গহনা প্রভৃতিতে ভিক্ষার ঝুলি এক রকম দুর্বহ হয়ে উঠেছে। সে বাসায় ফিরে তার দলের দশজন ছোক্‌রাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বল্‌লে—এই টাকা দিয়ে তোমরা জিলিপি আর সিগারে কিনে খাও গিয়ে। এ টাকা তোমাদের আমি নিজের গাঁট থেকে দিচ্ছি—ভিক্ষায় যা পাওয়া গেছে সে তো পরস্ব, তাতে তো আর আমরা হাত দিতে পারি না!

সকল লোকের মধ্যেই দয়া ও সৎপ্রবৃত্তি আছে ; নিষ্কর্মা ছোক্‌রারা পরাক্রমের দেওয়া পাঁচ টাকাতেই খুশী হয়ে চ'লে গেল।

পরাক্রম তার পর স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে হিসাব ক'রে দেখ্‌লে—সে সংগ্রহ ক'রে এনেছে এগার সের আড়াই পোয়া চাল, তিন শো বিয়াল্লিশ টাকা পৌনে সাত আনা নগদ, আর গহনা সোনা-রূপার খান কয়েক।

পর দিন সে বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা পাওয়া গহনাগুলি নিলাম হবে। ভালো ভালো দামী সোনার গহনাগুলো নিজে রেখে নিজের স্ত্রীকন্যার মরা-সোনার দু-তিন খানা ছোট খুচরা গহনা সে নিলামের জন্য রাখ্‌লে এবং কয়েকখানা রোল্‌ড্‌-গোল্‌ড্‌ আর কেমিক্যাল মায়াপুরী মেটালের গহনা কিনে এনে তার সঙ্গেই মিলিয়ে দিলে।

ত্যাগের প্রেরণায় যে-সব মহৎ-হৃদয়া মহিলা নিজেরদের অঙ্গের

অলঙ্কার খুলে দান করেছেন, তাঁদের সেই মহত্ত্বের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য এবং এই উপলক্ষে বন্যাপীড়িত দুঃস্থদের সাহায্য করবার জন্য বহু ধনী সেই নিলামের সময় উপস্থিত হলো। পরাক্রমের দুপাশে দুজন সেকরা পোদ্দার ব'সে আছে; পরাক্রম এক একখানা অলঙ্কার তুলে তাদের যাচাই করতে দিচ্ছে এবং তারা কষ্টিপাথরে ক'ষে নিক্তিতে ওজন ক'রে সেই অলঙ্কারের মূল্য নিরূপণ ক'রে দিচ্ছে। সেই মূল্য থেকে কিছু কম ক'রে পরাক্রম আরম্ভ করছে সরকারী ডাক: কিন্তু ধনীদের দান করবার প্রতিযোগিতার অলঙ্কারেয় মূল্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে দ্বিগুণ চতুর্গুণ বেড়ে যাচ্ছে। সেকরারা যে-সব অলঙ্কারকে রোল্‌ড্‌ গোল্‌ড্‌ বা কেমিক্যাল ব'লে প্রচার করলে—সেগুলিও নিলামে খাঁটি সোনার দামেই বিকালো।

নিলামের পর পরাক্রম হিসাব ক'রে দেখ্‌লে এতেও তার ঘরে চার শো ছত্রিশ টাকা এসেছে।

পরদিন কাগজে পরাক্রমের ভিক্ষার হিসাব বাহির হলো—

ভিক্ষায় পাওয়া নগদ —— ১৪২।৵১৫

অলঙ্কার নিলামে প্রাপ্ত —— ২৩৬৲

চাল —— সের।

ভিক্ষায় ও নিলামে পাওনা টাকার মধ্যে ৩।৵ মেকি মুদ্রা; পাঁচ টাকা ভিক্ষাকারীদের জলপানী। হস্তে মজুদ——৩৭০৲১৫ মাত্র।

তারপর দিনই মণ দশেক মোটা চাল আর ২০।২৫ জোড়া ছোট বড়

কাপড় কিনে নিয়ে পরাক্রম রওনা হয়ে গেল কাছাড়ে। কয়েক দিন পরে সে ফিরে এসে হিসাব দিলে—

তার ও তার ভৃত্যের পথের খরচ — ৬৩৷৷১৫
৮৲ টাকা মণ হিসাবে ৩০ মণ চাউলের
দাম ২৪০৲
ছোট বড় কাপড়ের মোট মূল্য . — ৫০৲
নগদ দান — ৩৬৲

মোট— ৩৮৯৷৷ ৫

অতিরিক্ত ব্যয় ১৯৷৷০

সকলে এই হিসাবে দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌ল—যে,কী মহৎ সেবার দৃষ্টান্ত? পরাক্রম নিজের পকেট থেকেও এত টাকা ব্যয় ক'রে এসেছে?

দুদিন পরে একটা রেজেষ্টারী চিঠির মধ্যে পরাক্রম দুখানা দশ টাকার নোট পেলে। তাতে এক টুক্‌রা কাগজে লেখা আছে বন্যাসাহায্যের ফাজিল খরচের জন্য। প্রেরকের নাম ধাম কিছু নেই।

পরাক্রমের পত্নী মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে—সংসারে এমন বোকা লোকও থাকে।

পরাক্রম বল্‌লে—বোকারা আছে ব'লেই তো সেয়ানা লোকদের চল্‌ছে। যাই হোক এ যাত্রা লাভ হলো মন্দ না। অনেক দিন চাল

আর কাপড় কিন্‌তে হবে না, আর নগদ টাকাও কিছু হাতে এসে গেল। এ আমার জেটিতে মাল-সরকারী করার চেয়ে ঢের ভালো ব্যবসা।

এর পরেই পরাক্রম কংগ্রেসে গিয়ে খুব গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে এল। দেশময় পরাক্রমের জয়জয়কার ঘোষিত হ'তে লাগ্‌ল।

কিন্তু শুধু জয় ঘোষণা শুনে তো পেট ভরে না। কাজেই পরাক্রম একটু চিন্তিত হয়ে উঠ্‌ছিল। এমন সময় তার ভাগ্যক্রমে দেশময় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়ে গেল। পরাক্রম তার পাড়ার নিষ্কর্মা লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের জুটিয়ে তাদের বুকে জাতীয়-পতাকার ব্যাজ এঁটে কুচ-কাওয়াজ ক'রে রওনা হয়ে গেল ধাপার জলার দিকে, নুন তৈরি করতে হবে।

পুলিস তেড়ে এল। পরাক্রমের দল রুখে দাঁড়ালো। পুলিস লাঠি চালালে। পরাক্রমের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়্‌ল।

পরাক্রমের সৈন্যদল পুলিসের মার খেয়ে জখম হয়ে আবার সেই দিনই ফিরে এল; কিন্তু পরাক্রমের আর কোনো সংবাদই পাওয়া গেল না। পরাক্রম প্রাণভয়ে যে দিকে দু' চোখ যায় দৌড় দিয়েছিল। অক্ষত শরীরে তার দলের মধ্যে ফিরে আস্‌তে লজ্জা করতে লাগ্‌ল। কাজেই সে ৪।৫ দিন গা-ঢাকা হয়ে থেকে এক দিন নিজের জামা-কাপড় নিজেই ছিঁড়ে ফেলে, মাথায় ও হাতে ছেড়া কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফিরে এসে রটিয়ে দিলে পুলিস তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে হাজতে রেখে দিয়েছিল! সবে আজ ছেড়ে দিয়েছে।

তার পরেই কল্‌কাতার সভায় সভায় পরাক্রমের তেজস্বী বক্তৃতার বন্যা ছুট্‌তে লাগ্‌ল। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, হাতের কব্জিতে কাপড়ের পটী বাঁধা। তাই দেখিয়ে সে চীৎকার ক'রে ঘোষণা কর্‌তে লাগ্‌ল নিজের বীরত্ব ও পুলিসের নৃশংসতা। পরাক্রমের দৃষ্টান্ত ও বক্তৃতা দেখে শুনে লোকের মন থেকে অহিংস সত্যাগ্রহের উপসর্গটা লোপ পেয়ে যাবার উপক্রম হলো।

পুলিস চিন্তিত হয়ে উঠ্‌ল। ইন্‌স্পেকটরেরা পুলিস-কমিশনারের কাছে গিয়ে বল্‌লে—পরাক্রমকে প্রসিকিউট না কর্‌লে তো আর চলে না; তার বাড়াবাড়ি বেড়েই চলেছে।

পুলিস-কমিশনার বল্‌লে—আচ্ছা, দুদিন ভেবে দেখি।

পরাক্রমের যে রকম প্রতিষ্ঠা তাতে তাকে গেরেপ্তার কর্‌লে একদিন দেশব্যাপী হরতাল হওয়া তো অনিবার্য; তারও বেশী আর না কিছু গণ্ডগোল হয়? পুলিস-কমিশনার চিন্তিত হয়ে গেলেন পুলিস বিভাগের ব্যবস্থাপক এক্‌সিকিউটিভ কাউন্সিলারের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে।

এক্‌সিকিউটিভ কাউন্সিলার, গভর্ণরের চীফ সেক্রেটারী ও পুলিস-কমিশনার পরাক্রমের পার্সোনাল ফাইল দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌লেন পরাক্রমকে নিয়ে কি করা যায়?

চীফ সেক্রেটারী পরাক্রমের জীবনের সব ইতিহাস দেখে শুনে ঈষৎ হেসে বল্‌লেন যে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে উপাধি বিতরণ হবে, সেই সঙ্গে পরাক্রমকে একটা রায়-বাহাদুর খেতাব দিয়ে দিলেই হবে।

চীফ সেক্রেটারীর পরামর্শ শুনে আর দুজনও হাস্‌লেন।

পরাক্রমের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা বেশ বেগেই চল্‌ল। পরাক্রম সরকারের বাজেয়াপ্ত বই সভায় চেঁচিয়ে পড়ে; পুলিসের নিষেধ অমান্য ক'রে সভা করে, মিছিল নিয়ে পথে পথে ফেরে, কিন্তু পুলিস কিছুতেই তাকে গেরেপ্তার করে না। পুলিস তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌ছে না দেখে পরাক্রম একদিকে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে আবার অন্যদিকে খুশীও হচ্ছে। নিগৃহীত লাঞ্ছিত না হ'লে তো পসার জমে না, আবার নিগ্রহ লাঞ্ছনা ভোগ ও সহ্য করাও তো সহজ ব্যাপার নয়। পরাক্রম পসার বজায় রাখ্‌বার জন্য বাক্যের উত্তাপ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলে যাতে পুলিসের ধৈর্য্যের বয়লার ফেটে যায় আর শ্রোতাদের শোণিতস্রোত টগবগ ক'রে ফুট্‌তে থাকে।

দেশী কাগজ তো সব বন্ধ। অকস্মাৎ শোনা গেল ফিরিঙ্গিদের আর সরকারের খয়েরখাঁ কাগজে খেতাবের যে নামাবলী ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে পরাক্রম সিংহ রায় বাহাদুরের কোটার প্রথমেই স্থান পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস কল্‌কাতাময় গুজব রাষ্ট্র ক'রে দিলে,—পরাক্রমটা গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, গোয়েন্দা!

এই গুজব দাবানলের মতন সকলের মনে সন্দেহ ছড়িয়ে দিলে। সবাই বলাবলি করতে লাগ্‌ল—আমি আগেই ভেবেছি. সি-আই-ডির চর না হলে এত দিন পুলিস ওকে রেয়াৎ ক'রে ছেড়ে দিয়েছে কেন?

বন-জ্যোৎস্না

শ্রদ্ধানন্দ-পার্কে মিটিং—বিলাতী-বর্জন, আইন লঙ্ঘন, দেশব্রত ধারণ সঙ্কল্প করতে হবে। সেই সভায় পরাক্রমের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধেও ধিক্কার দেওয়া হবে।

পরাক্রম বেচারা শুনে তো একেবারে মুষ্ড়ে পড়্ল। সে ব্যস্ত হয়ে তার সহকর্মী নেতাদের যার কাছেই বল্‌তে যায় যে সে নির্দোষ, এই খেতাবের বিড়ম্বনার জন্য সে দায়ী নয়, সেই ব্যক্তিই তাকে বলেন—যান যান মশাই, চেনা গেছে, বাহাদুরী খুব দেখিয়েছেন আর রায়-বাহাদুরী দেখাতে হবে না।

পরাক্রম সর্বত্র পরাহত ও অপমানিত হয়ে শেষে স্থির করলে সে আজ মিটিঙে গিয়ে প্রকাশ্য সভায় রায় বাহাদুর খেতাব প্রত্যাখ্যান ক'রে নিজের চরিত্রের সাফাই প্রমাণ দেবার চেষ্টা করবে।

সে সভায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করতেই চারদিক থেকে টিট্‌কারী শুন্‌তে লাগ্‌লো—ওরে ঐ টিকটিকিটা আবার এসেছে রে !—বেঁড়ে ছিল,এতদিনে লেজ গজিয়েছে !·········মার মার ওর মাথায় তিনটে টোক্কা মার, এখনি ট্যাকট্যাক ক'রে কি অমঙ্গল রটাবে তার ঠিক নেই !

এই কথা বল্‌তে না বল্‌তে চারদিক থেকে পরাক্রমের মাথায় গাঁট্টা বর্ষণ হতে লাগ্‌ল।

পরাক্রম আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—ভাই সব আমার কথা একবার শোন······আমি······

জনতা টিট্‌কারী দিয়ে উঠল—বিভীষণ ভায়া, ভালোয় ভালোয় স'রে

পড়ো।······কৈ চাচার এক গালে কালী আর এক গালে চুন লাগিয়ে ছেড়ে দে······

হঠাৎ একজন ছোকরা এসে একতাল গোবর পরাক্রমের মুখের উপর চেপে দিয়ে বল্‌লে—আহা বাছাধনের শ্রীমুখের একটা ছাঁচ তুলে রাখি।

চারিদিকে হাসির হট্টগোল লেগে গেল—আর সঙ্গেসঙ্গে চীৎকার হতে লাগ্‌ল—ব্রেভো! ওয়েল সার্ভ্‌ড্‌! বন্দে মাতরম্‌! শেম্‌ শেম্‌! ফাই ফাই!

নানা-শব্দ মিশ্রিত হয়ে পরাক্রমের কানে যেন শেল বিদ্ধ করতে লাগ্‌ল। সে গোবর-মাখা মুখ চাদরে মুছ্‌তে মুছ্‌তে মূর্ছাপন্ন অবস্থায় ভিড়ের ভিতর থেকে পলায়ন কর্‌ল। কিন্তু সে যেখানেই যায় সেখানেই শোনে—ঐ, ঐ যাচ্ছে সয়তান···বিভীষণ······শকুনি······

পরাক্রম কোনো মতে বাসায় গিয়ে লুকিয়ে বাঁচ্‌ল।

পরাক্রমের বাহিরে যাওয়া দায় হয়েছে। পথে বেরুলে ছেলেরা গায়ে ধুলো দেয়; মেয়েরা বাড়ীর উপর থেকে গোবরের জল গুলে মাথায় ঢেলে দেয়; যুবকেরা তাই দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে গড়িয়ে পড়ে আর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেবার ভয় দেখায়; বৃদ্ধেরা টিটকারী দিয়ে একটু হেসে শুধু বলে—কি মশাই! কেমন হচ্ছে?

পরাক্রম অতিষ্ঠ হয়ে একেবারে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর্‌লে এবং কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্‌লে—হুজুর, এ কী কঠিন শাস্তি দিলেন আমাকে? এত লোককে জেলে দিচ্ছেন, ইণ্টার্ণ্‌ কর্‌ছেন, কেবল আমার প্রতিই এমন অবিচার কর্‌লেন কেন?

চীফ সেক্রেটারী হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন কি হয়েছে ?

পরাক্রম বললে—আমার যে রুজি মারা গেল। এখন আমার সংসার চলবে কিসে ?

সেক্রেটারী হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মাসে কত আয় হতো পেট্রিয়টগিরিতে ?

পরাক্রম লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে বললে—আজ্ঞে গড়ে শ পাঁচেক টাকা হাতে আসত বৈ কি।

সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করলে—তা এখন আপনি কি চান ?

পরাক্রম বললে—আমাকে একটা চাকরী দয়া ক'রে যদি দেন……

সেক্রেটারী মুচ্‌কি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি সয়তানী গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করবেন ?

পরাক্রম হেসে বললে—হুজুর, মুখের কথায় আর পেটের কথায় পার্থক্য অনেক।

সেক্রেটারী বিদ্রূপ ক'রে বললেন—কি কাজ করবেন ? অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন ?

পরাক্রম কৃতার্থ হয়ে তাড়াতাড়ি বললে—যে আজ্ঞে হুজুর, তা হলেও আমি আমার সংসার এক রকম ক'রে চালিয়ে নিতে পারব।

সেক্রেটারী হেসে বললেন—আচ্ছা, পরের গেজেটে আপনি শিয়াল-দহের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হবেন।

শঠে শাঠ্য

কল্‌কাতার চৌরঙ্গী রোডের উপর সন্তরাম জীবনরাম ভাটিয়ার মং বড়ো দোকান; সেই দোকানে অতি পুরাতন দুর্লভ ও নানা দেশ বিদেশের বিচিত্র শিল্পসম্ভারের কারবার করে সে। তিব্বতের তৈরী মণিপদ্মে হুং, নেপালের যুগনদ্ধ মূর্তি, চীনের প্রাচীন পোর্সিলেন, জাপানের সাৎসুমা পোর্সিলেনের বাসন, বর্মার ছাতা, চীনা মান্দারিনের প্রাচীন ড্র্যাগন-আঁকা জোব্বা, চীনা চিত্রকরের প্রাচীন ছবি, জাপানী কিমোনো, জাপানী ছবি, সামুরাইয়ের তরোয়াল, বলীদ্বীপের ঘণ্টা, যবদ্বীপের মূর্তি, সিংহলের রূপা-বাঁধানো নারিকেল-মালার বাটি, গান্ধারের মূর্তি, ওয়াজিরিদের চাপ্‌লি জুতা, মেক্‌সিকোর ডাকাতদের ছোরা, কর্সিকার ডাকাতের কোমরবন্ধ, বেলোয়ারী কাচের সুতায় বোনা নেকটাই, র‍্যাফেল মুরিলো জশুয়া রেনল্‌ডের ছবি—এমনি কতো কি দামী আর দুর্লভ অদ্ভুত শিল্পসম্ভারে তার দোকান সৌন্দর্য আর বিস্ময়ের বিলাস-ভবন হয়ে আছে। দেশ-বিদেশের রাজামহারাজারা আর আমেরিকার মাল্‌টিমিলিওনিয়ার বা ক্রোড়পতিরা শীতকালে যখন কলকাতায় আসে,

তখন জীবনরাম বেশ মোটা রকম লাভ করে। অন্য সময়েও তার দোকানে লোকের ভিড় কম হয় না; ক্রেতা বেশী না থাকুক, কৌতূহলী দর্শকের আনাগোনায় জীবনরামের দোকান সর্বদাই সরগরম থাকে। তার দোকানে দামী জিনিস যেমন আছে, সস্তা অথচ সুন্দর জিনিসেরও অভাব নেই;—সিংহলের তাল-কাঠের ছড়ি, বর্মার গালার রঙে ছবি আঁকা বাঁশের কৌটা, দার্জিলিঙের রংচঙা পাথরের চেন হার দুল, জাপানের খড়ের চটি জুতা, উড়িষ্যার আব্‌লুশ কাঠের উপর হাড়ের কাজ-করা লাঠি আর বাক্‌স খুব অল্প দামেই বিক্রী হয়। যারা দোকানের শোভা আর দুর্লভদর্শন দ্রব্য দেখ্‌তে দোকানে যায়, তারা চক্ষুলজ্জার খাতিরে অল্পদামী একটা দুটো জিনিস কিনে আনে। এতেও জীবন-রামের জীবনযাত্রা বেশ সুখস্বচ্ছন্দেই চলতে থাকে।

কিন্তু পুলিশের সন্দেহদৃষ্টি লেগে থাকে এমনি প্রাচীন আর দুর্লভ মণিহারী ও মনোহারী দোকানের উপর। পুরাণো জিনিসের বেশীর ভাগ চোরাই মাল হওয়া সম্ভব, নইলে এমন সব দুর্লভ দ্রব্য স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করবে, এমন হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া জগতে খুব বেশী আছে ব'লে মনে হয় না। পুলিশ খবর পেয়েছে, জীবনরাম চোরাই মালের কারবার করে; চোরাই মাল কিনে সে এমন নিপুণভাবে সেগুলির গঠনে আর চেহারায় অদলবদল ঘটায় যে, সেই দ্রব্য যার চোখের সাম্‌নে থেকে থেকে অতি পরিচিত হয়ে গেছে, সেই মালিকও আর তার নিজের মাল চিন্‌তে বা সনাক্ত করতে পারে না। পুলিশের গোয়েন্দারা

সাধারণ ভদ্রলোক ক্রেতার বেশে প্রত্যহ দোকানে এসে ঘোরাফেরা করে; অদ্ভুত বা দামী বা দুর্লভ জিনিস চুরি যাওয়ার খবর পেয়েই পুলিশের লোক জীবনরামের দোকানে ছদ্মবেশে এসে ঘুরে যায়; কিন্তু তাকে ঘুণাক্ষরেও কলঙ্কভাগী করতে পারে, এমন চিহ্ন এ পর্যন্ত তারা আবিষ্কার করতে পারেনি।

পুলিশের কাছে খবর এলো, এক সৌখীন ধনীর বৈঠকখানা থেকে একটি তিব্বতী মণিপদ্মে হুং চুরি গেছে। সেই জিনিসটি হচ্ছে একটি রূপার অষ্টদল পদ্ম। পদ্মকোষটি সোনার, তার উপরে অষ্টধাতুর একটি বজ্র আছে, বজ্রটির দুই মুখে আর মধ্যদেশে তিনটি মরকতমণি বসানো আছে; পদ্মের আটটি পাপ্‌ড়িতে বিচিত্র কারুকার্য করা, একটি পাপ্‌ড়ি একটু ভাঙা; পদ্মকেশরগুলি সোনার তারের মুখে মুক্তা লাগিয়ে তৈরি; পদ্মটি একটি বেদীর আকারের যন্ত্রের উপর স্থাপিত; সেই যন্ত্রবেদী ধ'রে পদ্মটী শূন্যে তুললে পদ্মের অষ্টদল মুদ্রিত হয়ে পদ্মকোষস্থিত বজ্রটীকে আবৃত করে, আর পদ্মটীকে শূন্য থেকে নামিয়ে যন্ত্রবেদীকে কোনো আধারের উপর স্থাপন করলে পদ্মটীর অষ্টদল বিকশিত হয়ে খুলে ছড়িয়ে পড়ে আর পদ্মকোষস্থ বজ্রটী প্রকাশিত হয়ে যায়। পুলিশের সন্দেহ হলো, এমন দুর্লভ বিচিত্র দ্রব্য নিশ্চয় জীবনরামের দোকানে গোপন অভিসার করেছে বা করবে। পুলিশ বহু দিন তক্কে তক্কে ফিরলো, কিন্তু চোরাই মালের কোনোই সন্ধান মিললো না।

এক দিন জীবনরাম তার দোকান থেকে বেরিয়ে মোটরগাড়ীতে

চড়্‌তে যাবে, এমন সময় এক জন পুলিশ-অফিসার এসে তাকে বল্‌লে—আপনার নামে একটা ওয়ারেণ্ট্‌ আছে।

জীবনরাম আশ্চর্য ও ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমার নামে ওয়ারেণ্ট্‌?

পুলিশ অফিসার বল্‌লে—হ্যাঁ, এই দেখুন।

পুলিশ অফিসার জীবনরামের সাম্‌নে একখানা ওয়ারেণ্ট্‌ মেলে ধর্‌লে।

জীবনরাম সেই কাগজখানার উপর চোখ ফেলেই প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল; সে বল্‌লে—এ ওয়ারেণ্ট তো নেকিরাম জীবনরামের নামে; আমার নাম তো সন্তুরাম। এ ওয়ারেণ্ট্‌ আমার নয়।

অফিসার বল্‌লে—আপনি হয় তো নাম বদ্‌লেছেন।

জীবনরাম হেসে বল্‌লে—বদ্‌লাতে হ'লে লোকে নিজের নামটাই বদ্‌লায়, বাপের নাম কেউ বদ্‌লায় না। আমি সন্তুরামের পুত্র জীবনরাম; আর এই ওয়ারেণ্ট্‌ যার নামে, সে নেকিরামের পুত্র জীবনরাম।

অফিসার বল্‌লে—তা হবে। তা হ'লে আপনি যদি একবার অনুগ্রহ ক'রে পুলিশ-কমিশনারের আফিসে গিয়ে কমিশনার সাহেবকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলেন, তবে সকল গোল মিটে যায়।

জীবনরাম বল্‌লে—চলুন; কমিশনার সাহেবের সঙ্গে তো আমার পরিচয় আছে; তিনি তো আমার দোকানের খরিদ্দার।

অফিসার বল্‌লে—তা হ'লে তো আর কোনো ভাবনাই নেই।

আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, আমরা হুকুমের চাকর, আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।

জীবনরাম এ কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—এ ওয়ারেণ্ট্ কিসের জন্যে ?

অফিসার বললে—এ সি আই ডি'র ওয়ারেণ্ট্, এর কারণ বলবার নয়। তবে আপনি যখন সেই লোকই নন, তখন আপনাকে বলি—রাওলপিণ্ডিতে যে পুলিশ-অফিসার খুন হয়েছে সেই সম্পর্কেই।

জীবনরাম বললে—ওঃ! আমার কোনো পুরুষের সঙ্গে রাওলপিণ্ডির কোনো লোকের সম্পর্কই নেই। আর আমি তো ছ মাসের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাই-ই নি, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

অফিসার বললে—তা হ'লে আপনি একবার গিয়ে এই কথাটা বললেই হবে। আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি, মাপ করবেন।

জীবনরাম মনে মনে বিরক্ত ও একটু ভীতও হয়েছিল, তাই পুলিশ অফিসারের ক্ষমা-প্রার্থনার উত্তরে সে বিনয় প্রকাশ ক'রে বলতে পারছিল না যে, আপনার আর দোষ কি অথবা আমার এতে আর কষ্টই বা কি। সে অফিসারের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের দোকানের কর্মচারীকে ডেকে বললে—এ ভাই দৌলতরাম, আমি পুলিশ-কমিশনারের আফিসে যাচ্ছি; এই আফিসার এক নেকিরাম জীবনরামের নামে ওয়ারেণ্ট্ এনে আমাকে গেরেপ্তার করতে চান। আমি পুলিশ-

কমিশনার সাহেবকে বললেই তিনি এই অফিসারের ভুল বুঝতে পারবেন, কারণ তিনি তো আমাকে ভালো রকমই চেনেন।

এই বলে জীবনরাম পুলিশ-অফিসারের মোটরে চ'ড়ে চ'লে গেল।

জীবনরাম পুলিশ-কমিশনারের আফিসে গিয়ে পুলিশ-কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার বল্লেন—পুলিশ-কমিশনার এখন নেই। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন না, আপনার কোনো আশঙ্কাও নেই। আপনি যে এক জন বড় নামজাদা ব্যবসাদার, তা কলকাতা শহরের কে না জানে? তবে একটা সন্দেহ মীমাংসা করবার জন্যই আপনাকে একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হয়েছি। আপনি আমাদের সেই বেয়াদপি মাপ করবেন। আপনি বসুন। হর্ষ-বাবু, সেই নেকি-রাম জীবনরামের ফাইলটা নিয়ে আসুন দেখি।

যে পুলিশ-অফিসার জীবনরামকে গেরেপ্তার ক'রে এনেছিল, সে ঘরের এক পায়রা-খোপ আলমারী থেকে একটা ফাইল এনে ডেপুটি-পুলিশ কমিশনারকে দিলে।

ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সেই ফাইলের ভিতর থেকে একখানা লেখা কাগজ বাহির ক'রে জীবনরামকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখুন তো, এ লেখা কি আপনার?

জীবনরাম সেই গুজরাটী লেখা কাগজখানা হাতে নিয়ে প'ড়েই বল্লে—না, এ লেখা আমার নয়।

ডেপুটী-কমিশনার বল্লেন—আপনি একখানা কাগজে এই-কাগজে-

লেখা কথা কটা অনুগ্রহ ক'রে লিখুন; আমাদের হ্যাণ্ড্রাইটিং এক্সপার্ট্কে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে চাই। সে যদি বলে, এই দুই কাগজের লেখা এক হাতের নয়, তা হলেই আপনাকে আর আমরা কষ্ট দেবো না।

জীবনরাম একখানা কাগজের উপর পূর্বপ্রদর্শিত কাগজের লেখা কথাগুলি লিখল—তার মর্ম হচ্ছে—'পুলিশ সব টের পেয়েছে; এই পত্রবাহক যা বলবে, সেই রকম ব্যবস্থা করবে। বেশী লেখ্বার সময় ও সুবিধা নেই।'

লেখা শেষ ক'রে জীবনরাম কাগজখানা ডেপুটি কমিশনারকে দিতে উদ্যত হ'ল।

ডেপুটি কমিশনার বল্লেন—ওর নীচে আপনার নামটা সই করুন, তা হ'লে আমরা বুঝতে পারব, কোনটা আপনার লেখা।

জীবনরাম নাম সই ক'রে দিলে।

হর্ষ-বাবুকে সেই কাগজ দু'খানা দিয়ে ডেপুটি কমিশনার বল্লেন—হর্ষ-বাবু, হ্যাণ্ড্রাইটিং এক্স্পার্টকে লেখা দু'টো দেখিয়ে তাঁর অভিমত লিখিয়ে নিয়ে আসুন।

হর্ষ-বাবু কাগজ নিয়ে চ'লে গেল।

জীবনরাম ব'সেই আছে। হর্ষ আর ফেরে না। প্রতীক্ষার প্রত্যেক ক্ষণ জীবনরামের কাছে যুগান্ত ব'লে মনে হচ্ছিল।

অনেক ক্ষণ পরে ডেপুটি কমিশনারের ঘরের টেলিফোনের ঘণ্টা

বেজে উঠল। ডেপুটি কমিশনার টেলিফোন্ ধ'রে কথা শুনে বল্‌লেন—আচ্ছা।

তারপর টেলিফোনের চোঙ রেখে দিয়ে ডেপুটি-কমিশনার জীবনরামকে বল্‌লেন—আপনি এখন যেতে পারেন। আমাদের হস্তাক্ষর-পরীক্ষক বল্‌লেন যে, আপনার হস্তাক্ষরের সঙ্গে আমাদের কাগজের লেখা মিল্‌ল না। আপনাকে যে আমরা অকারণে একটু কষ্ট দিলাম, তার জন্ম আমাদের ক্ষমা করবেন।

জীবনরাম খুবই রুষ্ট হয়েছিল; সে কোন কথা না ব'লে ডেপুটি-কমিশনারকে অভিবাদন করলে এবং জোরে জোরে পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

জীবনরাম একটা ট্যাক্‌সি ডেকে নিজের দোকানে ফিরে গেল। সে গাড়ী থেকে নেমেই দেখলে একখানা মোটর-লরীতে তার দোকান থেকে বহু সামগ্রী বাহির ক'রে এনে তোলা হচ্ছে' সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার দোকানের কর্মচারী দৌলতরাম আর একজন অপরিচিত গুজরাটী-পোষাকপরা লোক।

জীবনরাম আশ্চর্য্য হয়ে দৌলতরামকে জিজ্ঞাসা করলে—এ-সব জিনিস কোথায় যাচ্ছে? সব কি বিক্রী হয়েছে?

জীবনরামের এই প্রশ্নে দৌলতরাম আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—বিক্রী তো হয় নি; এই বাবু আপনার চিঠি নিয়ে এসে বল্‌লে যে পুলিশ চোরাই

মালের খবর পেয়েছে ; এখনই খানা-তল্লাসী করতে আসবে, তার আগে সব মাল সরিয়ে ফেল্‌তে হবে।—এই তো আপনার চিঠি।

দৌলতরাম জীবনরামের হাতে চিঠি দিলে। জীবনরাম বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষুর উৎসুক দৃষ্টি কাগজের উপর স্থাপন ক'রেই দেখ্‌লে—পুলিশ আফিসে যে কাগজ সে লিখেছিল—"পুলিশ সব টের পেয়েছে ; এই পত্রবাহক যা বল্‌বে সেই রকম ব্যবস্থা করবে! বেশী লেখ্‌বার সময় ও সুবিধা নেই।' এ সেই কাগজ!

জীবনরাম বিহ্বল দৃষ্টি তুলে অপরিচিত গুজরাটী লোকটির দিকে তাকাল। সেই লোকটি মৃদু হেসে বল্‌লে—আমি পুলিশের লোক।

ঠিক সেই সময়ে হর্ষ-বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে এসে বল্‌লে—জীবনরাম বাবু, আমি আপনাকে ব-মাল গেরেপ্তার করছি। আপনাকে আর-একবার কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে। তবে এবার একলা নয়, আপনার সঙ্গী হবেন দৌলতরাম।

জীবনরাম বজ্রাহতের মতন নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের ধূর্ত কৌশলের কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

নবীন রাশিয়ার তিনটি ছোট্ট গল্প

১। আমার বিবাহিত জীবন

আমি কি বিবাহ করিয়াছিলাম বন্ধু? হ্যাঁও বটে, নাও বটে। হায় রে অদৃষ্ট! আমার দাম্পত্য-সৌভাগ্য মূলেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যে তাড়াতাড়ি উহা গজাইয়া উঠিয়াছিল! যে আবেগে আমার বিবাহের আগ্রহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অতি তুচ্ছ। আমার একটা ওভারকোট কেনা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। আমি একটা পুরাতন পোশাকের দোকান হইতে একটা কোট কিনিয়া গায়ে চড়াইয়া লইলাম। বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছি। পথে দেখিলাম, একটা মাল-বোঝাই গাড়ী ট্রামের লাইনে আটকাইয়া গিয়াছে, গাড়ীটা আর কিছুতেই নড়িতেছে না। আমরা তো সবাই সকলের বন্ধু, সেই বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, আমার গাড়োয়ান বন্ধুকে তাহার বিপদে সাহায্য করা উচিত। আমি আমার গায়ের সব জোর লাগাইয়া সেই গাড়ীর চাকা ঠেলিতে লাগিলাম। চাকা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করিতে করিতে নড়িল। গাড়ী লিক্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সচল হইল।

গাড়ীর চাকা তো নড়িল, গাড়ীও তো চলিল, কিন্তু আমার নূতন ওভার-কোটের বোতামগুলিও নড়িয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে—জামার

কাপড় শুদ্ধ খানিকটা খাব্লাইয়া লইয়া গিয়াছে। গাড়োয়ান বন্ধু অবশ্য প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতার বশে আমার হাত ধরিয়া ধন্যবাদ জানাইল। তাহার অপেক্ষা আমি বেশী খুশী হইলাম—যখন বন্ধু আমার হাত ছাড়িয়া দিল, কারণ, আমার কোটকে গায়ে রাখিবার জন্য আমার দুইটা হাতেরই দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি দৌড়াইতে লাগিলাম। যে-সব লোকের গায়ে আমি ধাক্কা লাগাইতেছিলাম, তাহারা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছিল—দোহাই ভগবানের, আরও জোরে দৌড়াইয়া যাও বন্ধু, নহিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে! আমি ত লজ্জায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং আমার পা-জোড়া যত দ্রুত আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তত দ্রুত আমি দৌড়াইতে লাগিলাম। অবশেষে একদম বেদম হইয়া আমার ঘরে গিয়া পৌছিলাম, এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

তখন আমি আমার কোটের পলাতক বোতামগুলির স্থান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতে বসিলাম। এই দুষ্কর কাজ করিতে করিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, হায় রে দুর্ভাগ্য! আমার এমন কেউ এক জন নাই যে, আমার কোটটায় কয়েকটা বোতাম লাগাইয়া দিতে পারে! তখনই আমার মগজের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎঝলকের মতন বিবাহ করিবার ইচ্ছাটা প্রবাহিত হইয়া গেল,. তাহা হইলেই ত আমার সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতে পারে।

এখন শুনুন কি ঘটিল!

বন-জ্যোৎস্না

আমাদের কারখানার কাছেই একটা মেয়েলোক থাকিত, সে ফল বিক্রয় করিত। সে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, খোদার খাসীর মতো নাদুসনুদুস, গোলগাল যেন একটি ফুটবল! সে দেখিতে বেশ, তাহাকে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; সে মনোহারিণী কি না, জানি না, কিন্তু নয়ন-মোহিনী বটে! তাহার নাম দরিয়া সেমেনোভ্‌না। আর সত্য কথা বলিতে লজ্জা কি, আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমি তাহার সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিবার সুযোগ কখনও ছাড়ি নাই এবং যতক্ষণ পারি সেই ফলের দোকানের উঁচু পৌতার ধারে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত আলাপ চালাইতে চেষ্টার ত্রুটি কখনও করি নাই।

এইরূপে আমার বিবাহ করার সঙ্কল্প ঘটিয়া উঠিল। আমি একটা আন্‌কোরা নূতন কোট গায়ে চড়াইলাম, চুল আঁচ্‌ড়াইয়া বুরুশ করিলাম, আমার হাত দুখানা বেশ করিয়া সাফ করিয়া লইলাম এবং কম্পিত দুরুদুরু হৃদয় লইয়া দ্রুতগতিতে দরিয়ার ফলের দোকানের দিকে রওনা হইলাম।

আমি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক বাজে কথা বকিয়া অবশেষে বলিয়া ফেলিলাম,—আচ্ছা বন্ধু, তুমি কবে কাজ থেকে নিজেকে আজাড় ক'রে ছুটি নেবে?

দরিয়া ধূর্ত কুটিল হাসির ভিতর হইতে বলিল, "তা গরজের জরুরীর উপর নির্ভর করে।"

"আমার খুব জরুরী একটা গরজ আছে। যে-সব মেয়ে আমার গায়ে পড়্‌তে চায়, তাদের কাউকেই আমার তেমন পছন্দ নয়। কিন্তু তোমার মধ্যে বেশ একটি পরিপক্কতা আছে।"

যখন দরিয়া দেখিল যে, আমার মনে একটা জরুরী গরজই বাস্তবিক চাপিয়া উঠিয়াছে, তখন সে গম্ভীর ভারিক্কি চালে বলিল,—"আমি তোমাকে সুখী কর্‌তে সর্বদাই প্রস্তুত আছি।"

"তবে আর কি, চলো।"

তার পরের দিনই আমাদের উভয়ের বিবাহ রেজেষ্টারী হইয়া গেল।

আমার নববধূ আমার গৃহলক্ষ্মী-রূপে ঘরবসত করিতে আসিলেন, সঙ্গে লইয়া আসিলেন একটি বড় রকমের পোটলা, তাহার মধ্যে কয়েক-খানা বিছানার চাদর আর জানালা-দরজার পর্দা ছিল; আর সঙ্গে আনিলেন একটা মাটির টবে বসানো একটা বাহারে পাতার চারা-গাছ, সেটা আমার ঘরের জানালা শোভা করিয়া বসিবে। মোট কথা, তিনি যে যৌতুক লইয়া আসিলেন, তাহা পরী-রাণীর উপযুক্ত।

পরের দিন সকালে আমি যখন ঘুম ভাঙিয়া বিছানা হইতে দেখিলাম যে, খাইবার টেবিল দিব্য পরিপাটী করিয়া সাজানো হইয়াছে, তখন আমি ভারি খুশী হইয়া মনে মনে ভাবিলাম যে, আমি মুখ-হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতে না আসিতে চা তৈয়ারি হইয়া যাইবে নিশ্চয়। বিবাহ ব্যাপারটা নবাবী রকমের অতি সুখজনক বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

বন-জ্যোৎস্না

পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে একেবারে কবিকল্পনা বা আকাশকুসুম নহে, ইহা অনুভব করিয়া বড়ই আরাম বোধ করিলাম। আমি পরম আরামে কয়েক বার গরম বিছানায় গড়াগড়ি দিলাম, তাহার পরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া একবার গায়ের আড়ামোড়া ভাঙিয়া লইলাম, চোখ কচ্‌লাইয়া চোখের ঘুম ও জড়তা দূর করিয়া ফেলিলাম—দেখিলাম, জলখাবারের টেবিলে বসিয়া একটা বছর দশেকের ছেলে ক্ষুধার ব্যগ্রতার সহিত হাঁউ হাঁউ করিয়া একটা অ্যাপেলে কামড় লাগাইতেছে।

আমি আমার প্রেয়সী গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ ছেলেটি কে? তোমার কোনও আত্মীয় বুঝি একে দিয়ে বিবাহের আশীর্বাদী যৌতুক কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে? এ তো তাদের অতি সুবিবেচনার বিষয়।"

আমার প্রিয়া আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"ওগো না, তা কেন। এ যে আমার ছেলে। ঘেটের বাছা এত দিন আমার মায়ের কাছে ছিল।"

আমার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলাম,—"বলি, তাই নাকি। তা এত কথা পেটে পোরা ছিল, আগে বলা হয় নি কেন? দিব্য ঠাণ্ডা তরমুজটির মতন তো গড়াতে গড়াতে আমার ঘাড়ে এসে চেপে বস্‌লে। তখন এ সব ছিল কোথায়?"

সে বেশ ঝাঁঝের সহিত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"তুমি কি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে, না বল্‌বার কোনও অবকাশ দিয়েছিলে? আমাদের

বিয়ে হয়েছে যেন ওট ছুঁড়ী তোর বিয়ে। তা আমার যেটের বাছাকে দেখে তোমার অত রাগ করবার কিছু নেই, কারণ, আমার আগেকার স্বামী তার এই ছেলের জন্যে আমাকে মাসে মাসে খোরপোষ দিয়ে থাকে।"

আগেকার স্বামী! আমার মাথা আরও গরম হইয়া গেল, আমার রাগ করিবার কিছু নাই বটে! আমি রাগে গস্-গস্ করিতে করিতে কাজে বাহির হইয়া গেলাম।

যখন আমি কাজ হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমার চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। আমার চোখ দেখিতেছিল, খাইবার টেবিলে একটা ছেলে নয়—তুইটা! আমি বিস্ময়ে নির্বাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। সেই দ্বিতীয় ছেলেটি যে কে, তাহার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিবার অবসর আমাকে না দিয়া আমার প্রেয়সীই নিজে আমাকে দিব্যজ্ঞান দিয়া বুঝাইয়া দিলেন—"দেখ, এই আমার মেজো ছেলে। এও এত দিন তার দিদিমার কাছে ছিল, এত দিন পরে একে আমি নিজের কাছে আন্‌তে পার্‌লাম। এর জন্যেও তোমার কোনও ভাবনা কর্‌বার দর্‌কার নেই, কারণ, আমার দ্বিতীয় স্বামী—এর বাপ—এর খোরপোষের খরচ যোগায়।"

আমি ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হইয়া আমার মাথার টুপীটা চাপিয়া বসাইয়া দিলাম এবং আমার ক্রমবর্ধমান পরিবারের দিকে আর

না চাহিয়া রাগে টগবগ করিতে করিতে আমার বন্ধু মিতিয়ার কাছে ছুটিয়া গেলাম—আমার বিপদের কথা বলিতে।

মিতিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়াই তাহার দুই হাত আমার দিকে বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"বন্ধু, তুমি বিয়ে করেছ! বেশ, বেশ! এস, তোমাকে সম্বধনা করি, এস, এই আনন্দের ব্যাপারের জন্য আমরা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করি।"

কিন্তু আমি তাহার সম্বর্ধনায় কান না দিয়া মুখ বিরস করিয়া তাহাকে বলিলাম—"মিতিয়া, তুমি আমাকে রক্ষা কর ভাই, আমি চমৎকার একটি ভীমরুলের চাকের মধ্যে গিয়ে পড়েছি!"

তাহার পরে আমার মনে যে-সব কথা ফেনায়িত হইতেছিল, তাহা আমি তাহার কাছে নির্মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলাম।

সে আমার সব কথা নিবিষ্ট-মনে শুনিল, একবার তাহার মাথা নাড়িল, তাহার পরে আমার কাঁধে চাপড় মারিয়া বলিল—"ঐ স্ত্রীলোকটা তোমাকে রীতিমত ঠকিয়েছে দেখ্‌ছি। ঐ ধূর্ত্ত রায়বাঘিনী তোমাকে একদম বোকা বানিয়ে দিয়েছে। সে তোমার ঘাড়ে আধ ডজনখানেক ছেলে এনে চাপাবে, যদি সে যে পথ তোমাকে দেখিয়েছে, সেই পথে তুমিও না চলো।"

"তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। তোমার মৎলব কি? তাকে কি আমি কিঞ্চিৎ ঘুষিখেলার কসরৎ দেখিয়ে দেবো?"

"না না, তা হ'লে তুমি আবার আইনের মারপ্যাচে পড়বে, আইনের সঙ্গে তোমার বিরোধ বাধবে। তুমি চেষ্টা কর, স্বয়ং সয়তান তার সাঙ্গোপাঙ্গ বিয়ালজিবাব প্রভৃতিকে নিয়ে যাতে ভেগে পড়ে। সে তোমার ঘাড়ে দু'টি রাজপুত্র চাপিয়ে তোমাকে ঠকিয়েছে। তুমিও তাই কর।"

"কিন্তু এই বিশ্বসংসারে আমি ছেলে পাব কোথায় ?"

মিতিয়া তাহার কণ্ঠ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল। "তোমার দেখ্‌ছি একটা খরগোষের বাচ্চার চেয়ে বেশী মগজ মাথায় নেই। নাও নাও, শুয়ে পড়, কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নাও। তোমার দুটো ছেলে আমিই এখনই জোগাড় ক'রে নিয়ে আস্‌ছি !"

যেমন বলা, তেমনি ফলা। ঘণ্টাখানেক পরে মিতিয়া ফিরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে দুইটা ছোঁড়া। তাহাদের একটার মাথায় একটা টুপী আছে, তাহাতে একটা ব্যাজ লাগানো, আর তাহার গায়ের কোটটা একেবারে শতছিন্ন জরাজীর্ণ। অন্যটার গায়ে মেয়েদের একটা ছেঁড়া জ্যাকেট আছে, সেটা আবার হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, আর তাহার মোজহীন খালি পায়ে জুতার বদলে জুতার উপরে পরিবার একজোড়া গ্যালোশ আছে। দুই জনেরই গায়ের উপর ময়লা-মাটীর পলি আর প্রলেপ পড়িয়াছে, তাহাদের মুখ দুইখানি চিমনী-সাফ-করা লোকের মতো অথবা হাঁড়িখেকো মেনী বিড়ালের মুখের মতো কালো।

মিতিয়া বলিল—"এই দেখ, এই খাসা, নমুনা দুটি আমি কুরস্কি

ষ্টেশনে পেয়েছি। আমি পথেই এদের তালিম দিয়ে এসেছি এদের কি করতে হবে। এরা তোমাকে বাবা ব'লে ডাকবে, আর তোমার ফন্দি ফাঁস ক'রে দেবে না। যেটির মাথায় টুপী আছে, সেটির নাম মিচকা, আর অন্যটির নাম সেয়ানকা।"

মিচকা আগাইয়া আসিয়া আমাকে বলিল—"এটা দেনা-পাওনার ব্যাপার। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাদের পেট-ভরা খাবার দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাকে বাবা ব'লে ডাকব। আমাদের কাপড়-চোপড়ের দিকে তত গরজ নেই, তবে রোজ আমাদের দুটো ক'রে সিগারেট দিও।"

আমি তাহাদিগকে আমার বাড়ীতে লইয়া গেলাম। তাহাদের শ্রীমূর্তি দেখিয়াই আমার প্রেয়সীর ত মূর্ছা যাইবার মতো অবস্থা। সে সেই খুবসুরৎ চেহারার জলুস দেখিয়া তাহার শোকে একেবারে মরণাপন্ন হইয়া পড়িল। "এ কোন্‌দেশী চীজ? এই চিড়িয়া দুটি কোথা হইতে আসিল?"

আমি পরম শান্তভাবে প্রেয়সীকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"কে আর? এরা আমার প্রথম পক্ষের ছেলে। এত দিন এরা তাদের ঠাকুরমার কাছে ছিল।"

কিন্তু তিনি রাগে টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিলেন এবং টেবিল হইতে একটা একটা করিয়া সব কাচের গ্লাস তুলিয়া তুলিয়া মাটীতে আছাড় মারিয়া মারিয়া ভাঙিতে লাগিলেন। তিনি যতদূর গলা চড়িতে

পারে, ততদূর চড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এই রকম নর্দমার জানোয়ার, এই রকম নোংরা তেনা পরা ভূত তুমি আমার বাড়ীতে এনে হাজির করেছ!"

আমার প্রেয়সী যখন দম লইবার জন্য একবার থামিলেন, আমি সেই অবকাশে বলিলাম—"তা কি করি বলো, আমার তো আর বেশী আয় নেই যে, দু' জায়গায় খরচ চালাই। আর হাজার হোক ওরা তো আমারই রক্ত মাংস থেকে জন্ম লাভ করেছে!"

আমরা যখন দাম্পত্য আলাপ করিতেছিলাম, তখন মিচকা আর সেয়ানকা আমাদের শোরগোল একদম অগ্রাহ্য করিয়া টেবিলের সমস্ত খাবার একমনে সাবাড় করিতে লাগিয়া গিয়াছিল। এই দেখিয়া আমার প্রেয়সী একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া হুহুঙ্কারে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহার পরে তাঁহার একটু চেতনা ফিরিয়া আসিল, তিনি আমাকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ, আমরা যখন দুজনে দুজনের স্বামী ও স্ত্রী, তখন আমাদের উচিত নয় আমাদের দাম্পত্য-জীবনের সুখ নষ্ট ক'রে ফেলা। আমি আমার ছেলেদের ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাদের দিদিমার কাছে, তুমিও তোমার দুটিকে তাদের ঠাকুরমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

আমি মনে মনে জয়ের উল্লাস অনুভব করিয়া স্বগত বলিলাম---'আহা! এখন অন্য সুর বাজছে। ওষুধ ধরেছে।'

আমি প্রকাশ্যে বলিলাম—"বেশ, আমি তাতে রাজি।"

আমি মিচ্‌কা আর সেয়ান্‌কাকে চোখের ইসারা করিয়া বলিলাম—এই নে রে ছোঁড়ারা পাঁচটা পয়সা, আপেল কিনে খে গে যা। "যা যা, তাদের ঠাকুরমার কাছে দৌড়ে ফিরে যা।"

কিন্তু আমি আমার সাজানো ছেলেদের গুণ বুঝিতে পারি নাই। ছোঁড়া দুইটা আমার ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল—'আমরা তোমার সব জোচ্চুরি ফাঁস ক'রে দেবো, জুয়াচোর কাঁহাকা! আগে আমাদের পেটভরা খাবারের লোভ দেখিয়ে এখন পাঁচটা পয়সা ফেলে দিয়ে আমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক পেট খিদে নিয়ে আমরা গেলাম আর কি। তুমি এত সহজে অব্যাহতি পাবে মনে কোরো না। আমরা তোমার স্ত্রী ঠাকরুণকে একটি ছোট গল্প শুনিয়ে দি। শোনো ঠাকরুণ! একটা ছিঁচ্‌কে পুড়িয়ে লাল ক'রে নাও, আর তাই দিয়ে ছেঁকা দিয়ে এই সয়তানটাকে বাড়ী-ছোড়া কর। এ আমাদের ফুস্‌লিয়ে এনেছিল অভিনয় ক'রে মজা কর্‌বার জন্যে। আমরা কস্মিন্ কালেও ওর ছেলে নই।'

আমার স্ত্রী, যিনি এখনই পরম নরম স্বরে আমাকে পরস্পরের ছেলে প্রত্যাহার করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি যখন এই কথা শুনিলেন, তখন আবার রায়বাঘিনী হইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন—"ও-ও-ও! এ-এ-এ-ই! আমাদের মিলনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই তুমি আমাকে ঠকাতে আরম্ভ করেছ। আমি আর এক মুহূর্তও তোমার এই বাড়ীতে থাক্‌ব না। আমি তিন তিনটা হতচ্ছাড়াকে বিয়ে

করেছিলাম, কিন্তু তাদের একটাও তোমার মতন এমন ভয়ঙ্কর নয়।"

রাগে ক্ষেপিয়া গিয়া প্রেয়সী আমার জানালা হইতে পর্দাগুলা টানিয়া টানিয়া খুলিয়া লইল, বিছানার চাদর তুলিয়া লইল, তাহার বোচ্‌কা বাঁধিয়া তাহার হাতের মধ্যে গলাইয়া দুই হাতে তাহার দুই ছেলের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আমার বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মিচ্‌কা আর সেয়ানকা ও তাহাদের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল। তাহারা যাইতে যাইতে বারম্বার আমার দিকে মুখ ঘুরাইয়া বগ দেখাইতে লাগিল আর জিব বাহির করিয়া ভেঙ্‌চাইতে লাগিল।

আমার বিবাহিত জীবনের একটি ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া রহিয়া গিয়াছে আমার স্মৃতির মধ্যে। সমস্ত গাছটা শিকড় সুদ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে।

২। পড়ি কি না পড়ি প্রশ্ন ইহাই এখন

আমি হতভাগ্য মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের দেশে আর একটিও নিরক্ষর লোক নাই, সব নিরক্ষর লোক বহু পূর্বেই অক্ষর-পরিচয় করিয়া চুকিয়াছে।

অবশ্য আমি এ ধারণা করিয়া বসিয়াছিলাম না যে, দেশের সকল লোকে ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে, আর সকল লোকেই উচ্চ গণিতে তালিম হইয়া গিয়াছে। আমি সে চিন্তা করি নাই। কিন্তু নিজের দেশভাষাটা পড়িতে পারা আর নিজের নামটা দস্তখৎ করিতে পারা নিতান্ত গোড়ার সহজ অবস্থা—সেটা বোধ হয় দেশে এত দিনে কায়েমি হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ব্যাপারটা দেখা গেল নিতান্ত বিপরীত রকমের। সেই গল্পই তো বলিতে যাইতেছি, শুনুন।

গত মাসে কোনও একটা প্রধান কারখানায় নিরক্ষদের লায়েক করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প জোরে কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। মোট কথা, নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে, দেশোন্নতি-ব্যবস্থার দশম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে। এত দিনেও সমস্ত নিরক্ষর সম্পূর্ণভাবে সাক্ষর হইয়া উঠে নাই। এমন অবস্থা মোটেই ভালো নহে। লোকগুলা এমনি অভব্য।

এইজন্য কারখানার কর্তারা এই মর্মে মহোৎসাহে লাগিয়া গেলেন। জ্ঞানদায়িনী সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার সহকারীদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ, এই তো অবস্থা! অতএব আমাদের কর্মে অবতরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। কাল সন্ধ্যা আটটার সময়ে যাহারা পড়িতে বা লিখিতে জানে না, সেই-সব নিরক্ষর মূর্খদের একটি মিটিং করিতে হইবে। অতএব এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হোক।"

সহকারীরা সকলেই পরম ব্যগ্র মাথা-গরম ছোকরা। তাহারা তৎক্ষণাৎ এই মর্মে মাতিয়া উঠিল এইটা কার্যক্রম কি হইবে, তাহা আলোচনা করিতে লাগিয়া গেল।

যথাসময়ে পরের দিনের সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘড়ীর কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটার সময়ে জ্ঞানদায়িনী সমিতির সভ্যবৃন্দ যথাযোগ্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসিয়া হাজির হইলেন, স্বয়ং সভাপতি মহাশয় আসিলেন তাঁহার দপ্তর বগলে লইয়া। তাঁহারা আসিয়া সভায় সমাসীন হইলেন। কিন্তু সভায় যাহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল, যাহাদের জন্য সভা, সেই সব নিরক্ষররা কোথায়? তাহাদের এক জনেরও তো দেখা নাই।

সভাপতি বলিলেন—"সেই-সব নিরক্ষররা কোথায় হে? তোমরা কি নোটিশ দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে না কি?"

উৎসাহী সহকারীরা বলিল "ভুল! কখনই হইতে পারে না। আমরা মিটিং ঘোষণা করিয়া দিয়াছি যথারীতি। আমরা মিটিংএর নোটিশ কারখানায় প্রত্যেক সেক্সনে আঁটিয়া দিয়াছি।"

তাঁহারা সকলে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা সকলেই ভাবিতে লাগিলেন—নিরক্ষর মুর্খ আর কাহাকে বলে। দায়িত্বজ্ঞানহীন আহাম্মক যত! তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

নয়টা বাজিয়া গেল। কিন্তু তখনও কাহারও দেখা নাই। অবশেষে

দুই এক জন বেচারা গড়িমসি করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু জেরা করিয়া জানা গেল, তাহারা লেখাপড়া জানে, তাহারা ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে সভার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

তখন জ্ঞানদায়িনী সমিতির সভাপতি বলিলেন—"বন্ধুগণ, একবার বিশেষভাবে বিবেচনা ও প্রণিধান করিয়া দেখুন—যাহারা নিরক্ষর, তাহারা নিরক্ষর। তাহারা কেমন করিয়া আপনাদের মিটিংএর নোটিস পড়িবে?"

কমিটী চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"তাই তো! তাহারা তো নিরক্ষর, তাহারা তো পড়িতে পারে না!"

তখন তাহারা তিন জন বিশেষ প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের বৃহৎ কারখানার নানা বিভাগে পাঠাইয়া দিল। তাহারা প্রত্যেক বিভাগে গিয়া তিনজোড়া ফুস্‌ফুস্ হইতে বাতাস ছাড়িয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, আজ একটা মিটিং হইবে।

এ স্বতন্ত্র কথা। মৌলিক নিমন্ত্রণ সফল হইল। মোটের উপর চার জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, অবশ্য সভাপতি ছাড়া। জ্ঞানদায়িনী সমিতি ইহাদের ভার হাতে লইলেন।

৩। ভাঙ্গা ঘড়ী

চেয়ারে বেশ করিয়া বসিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকয়া সুস্পষ্ট সন্তুষ্টভাবে সে বলিল—"বেশ! আপনি এই রকম ক'রে কাজ করেন?"

আমি বিনয়ের সহিত হাসিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ।"

"আপনি কি অনেক দিন হ'তে খবরের কাগজে লিখ্‌ছেন?"

"চার বছর।"

"আমিও কিছু লিখ্‌ব স্থির করেছি, বুঝেছেন?"

আমি একটু কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি কিছু লিখেছেন?"

"আমি লেখাটা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনার পছন্দ হবে। আপনি নিশ্চয় ছাপ্‌বেন সেটা।"

"আপনি কি অনেক দিন থেকে অনেক লেখা লিখে আস্‌ছেন?"

"না। অনেক রকম কেজো কথায় আমার মগজ ভরা ছিল। এখন সেগুলি থিতিয়ে এসেছে। আমি আমার স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই এখন আমার সময় যে কি ক'রে কাটাই, তা ভেবে পাই না। এই জন্যই তো লেখায় হাত দিয়েছি। বল্‌লাম তো, লেখাটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি, আপনাকে ছাপ্‌তে দেবো। আপনি কয়েক লাইন প'ড়ে দেখুন,

তা হ'লেই আপনি মনে মনে বল্‌বেন যে, আবার যেন বায়রন এসে আবির্ভূত হয়েছেন।"

"যে আজ্ঞে। কিন্তু আমার এই লেখাটা এখনই সংশোধন ক'রে প্রেসে দিতে হবে।"—আমি আমার সম্মুখবর্ত্তী ভাবী লেখককে খোলসা করিয়া আমার কাজের তাড়া জানাইয়া দিলাম।

সে একটা মোটা ভারী কালো পোশাক পরিয়া আসিয়াছিল। সে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল। সে পরম সন্তোষের সহিত তাহার জুতার ডগার উপর নজর নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু সে আমাকে দু'মিনিটের বেশী নীরবে কাজ করিতে দিল না।

"আপনার বেশ মোলায়েম জীবন। আপনি লেখেন, ছাপ্‌তে দেন, ছাপা হয়, লোকে সেই লেখা পড়ে, আবার তা থেকে আপনি টাকাও রোজগার করেন।"

আমি কাজ হইতে মাথা না তুলিয়াই বলিলাম—"আপনি লেখাটাকে যত সহজ মনে করেছেন, তা কিন্তু আসলে নয়।"

বায়রনের নবাবতার অক্ষুব্ধভাবে বলিল—"সহজ নয়? আপনি ঠাট্টা করছেন? আমি তো টেবিলে গিয়ে কেবল বস্‌লাম আর যত পারি দ্রুত হাত চালিয়ে লিখে গেলাম, হুড়হুড় ক'রে লেখা বেরুতে লাগ্‌ল। পলক ফেল্‌তে লেখা হয়ে গেল।"

আমি আমার অসমাপ্ত অসংশোধিত প্রুফ সরাইয়া রাখিয়া বলিলাম—"আপনার সেই লেখাটা কৈ?"

"এই যে। এই আমার প্রথম উত্তম। তাই এটা আপনাকে আমি সস্তাতেই দেবো। প্রত্যেক লাইনের জন্য পনেরো পয়সা। ভবিষ্যৎ রচনার দর-দস্তুর এর পরে স্থির করা যাবে।"

"উত্তম। আপনি দু'হপ্তার মধ্যে এই লেখা সম্বন্ধে আমার অভিমত জান্‌তে পার্‌বেন।"

আমি আমার চোখের সাম্‌নে মেলিয়া রাখা হস্তলিপির উপর চোখ বুলাইয়া দেখিলাম এবং তাহাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—"দেখুন, এই প্রথম লাইনটা—'অস্তমান সূর্য দিগন্ত হইতে দীপ্তি পাইতেছিল।' এ তো একদম অসম্ভব।"

সে দিব্য প্রসন্ন-বদনে হাসিয়া বলিল—"তা আপনার যা খুশী তা বদল ক'রে দিতে পারেন। তাতে কিছু এসে যাবে না। এ আমার প্রথম উত্তম কি না। যাক, আমি আর আপনার মূল্যবান্ সময় নষ্ট কর্‌ব না।"

সে তাহার পকেট হইতে একটা ঘড়ী বাহির করিল।—"সয়তান! আবার বন্ধ হয়ে গেছে।"

"ওটা কি ভেঙ্গে গেছে না কি?"

"এই তো সেদিন মেরামত করিয়ে এনেছি। কিন্তু দেখুন এটার গতিক। কি ঝকমারি!"

"হ্যাঁ, এই-সব ঘড়ীওয়ালারা—আচ্ছা দেখি আপনার ঘড়ীটা হয় তো আমি ওটা চালিয়ে দিতে পার্‌ব।"

সে আমার দিকে আশ্চর্য্য হইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আপনি ঘড়ী মেরামত করতে পারেন ?"

"ও না পারার মধ্যেই।"

সে আমার হাতে ঘড়ীটা দিল। আমি অনিচ্ছুক ডালাটাকে খুলিলাম। তাহার পরে আমার চাকু-ছুরির ফলাটা সেই ঘড়ীর কল-কব্জার মধ্যে চালাইয়া দিলাম। কয়েকটা চাকা আর স্প্রিং খুলিয়া টেবিলের উপর গড়াইয়া পড়িল। আমি বিড়-বিড় করিয়া বলিলাম—"এ তো ভাল ব্যাপার নয়।" তাহার পর সরু হেয়ার স্প্রিংটা দুই আঙ্গুলে ধরিয়া টানিয়া খুলিয়া বাহির করিয়া ফেলিলাম। এই সময়ে আরও দুইটা স্ক্রু আর একটা কাঁটা খুলিয়া টেবিলের উপর ছড়াইয়া পড়িল।

চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটি আড়ষ্ট হইয়া বিশেষ অস্বস্তি ও অসন্তোষের সহিত আমার এই অনুসন্ধান লক্ষ্য করিতেছিল! সে চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি ?"

আমি কেস হইতে আরও কতকগুলা অংশ বাহির করিয়া ফেলিয়া বলিলাম—"এই ঘড়ীর ভিতরে এত নানা রকমের জিনিস ভ'রে রেখেছে যে, এই গোলমালের মধ্যে ঠিক করাই দুঃসাধ্য যে ব্যাপারটা কি ?"

লোকটি লাফাইয়া উঠিল। একবার সেই পেট-ফাটা নাড়ী-ভুঁড়ি বাহির করা ঘড়ীটার দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে দেখিল। তাহার পরে চেঁচাইয়া উঠিল—"তুমি কি ঘড়ীর কিছু বোঝো ছাই ?"

আমি ধীরস্বরে বলিলাম—হাঁও বটে, নাও বটে।"

"তুমি এর আগে কখনও ঘড়ী মেরামত করেছিলে কি ?"

"স্পষ্ট কথা বলিতে কি, না। এই আমার প্রথম উদ্যম।"

লোকটি ঘড়ীর সব চাকা স্প্রিং স্ক্রু কাঁটা কুড়াইয়া তুলিতে তুলিতে করুণস্বরে হতাশভাবে বলিয়া উঠিল—"তুমি যে কাজ মোটে জানো না, সে কাজে হাত দাও কেন বলো দেখি ?"

এখন আমার রাগ করিবার পালা। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"তোমার অমন কথা বল্‌বার কোনও অধিকার নেই। তুমি কোন্ আক্কেলে লেখায় হস্তক্ষেপ কর ? তুমি কি মনে কর যে, একটা ঘড়ীর কলকব্জা খুলে বসানোর চেয়ে সরস সুন্দর সাহিত্য রচনা করা এতই সোজা কাজ ?"

আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে এক মুহূর্তে ঘৃণা ও তাচ্ছীল্যের ভাবে চাহিয়া রহিলাম, তাহার পরে আমরা দু'জনেই হাসিতে লাগিলাম।

সে বলিল,—"আমার এই লেখাটা যদি ভাল না হয়ে থাকে তো আমি আপনাকে অন্য একটা লেখা এনে দেবো।"

আমি বললাম—"বেশ। আর আপনার যদি আর একটা ঘড়ী থাকে, তবে সেটা সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন। এই রকম ক'রে মক্‌স করতে করতে আমাদের দু'জনেরই হাত পেকে যেতে পারে!"

বিড়াল-দূত

মেঘমালা মা-বাপের এক সন্তান, কাজেই বাড়ীর সকলেরই আদরের মেয়ে। মেঘমালা কল্‌কাতার ডায়োসিসান কলেজ থেকে বি-এ পাশ ক'রে এখন কল্‌কাতা ইউনিভার্সিটিতে ইংরাজীতে এম-এ পড়ে। মেমের কাছে পিয়ানো আর বেহালা বাজাতে শেখে; আর সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে গান, সেতার, এস্‌রাজ শিখ্‌তে যায়; চিত্রকর চারু রায়ের কাছে ছবি আঁকারও চর্চ্চা করে। মেঘমালা যেন মূর্ত্তিমতী সরস্বতী, সর্ব্ববিদ্যায় তার আগ্রহ ও অধিকার অসাধারণ, তার বুদ্ধি প্রখর, ধারণাশক্তি অপরিমেয়। কিন্তু এত বিদ্যা শিক্ষায় ব্যাপৃত থেকেও তার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে; সে তন্বী, সুন্দরী; তার দেহ সুঠাম, সুবলয়িত, অনিন্দ্য। সে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ-মূর্ত্তি! তার স্বভাব মধুর; কিন্তু এত গুণের আধার ব'লে বাড়ীর লোকের অত্যধিক আদরে ও প্রশ্রয়ে একটু চঞ্চল, একটু রঙ্গপ্রিয়।

তার সকল প্রকার আব্দার-উপদ্রব বাড়ীর লোকে আনন্দ পেতেই সহ্য করে। তার ঠাকুরমা তার ঠাট্টাবিদ্রূপের জ্বালায় সারাদিন বিব্রত থাকেন।

বন-জ্যোৎস্না

মেঘমালা যত নানা বিদ্যায় বিভূষিত হয়ে উঠ্‌ছিল, বাড়ীর লোকের আনন্দ ও সহনশীলতা তত বেড়ে চলেছিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তাও তাঁদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুল্‌ছিল যে, এমন সুন্দরী গুণবতী মেয়ের উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? মেঘমালার পিতা-মাতা প্রায়ই ...নে এই বিষয় আলোচনা কর্‌তেন এবং দুজনেই স্নেহের টানে স্বীকার ...ন যে, আমরা জাত মান্‌ব না, যে-কোনো দেশের যে-কোনো ...ছেলে মেঘমালার উপযুক্ত অথবা তার মনোনীত হবে, তার ...মরা মেয়ে সম্প্রদান কর্‌ব—আমাদের ঐ এক সন্তান, ...সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌লেই হবে, কেবল জাত আর সমাজ নিয়ে আমরা কর্‌ব কি?

এহেন সর্ব্বপ্রিয় মেঘমালার একটি আচরণ কিন্তু বাড়ীর সকলের অসহ্য হয়ে গেল—যে দিন সে তার শিক্ষয়িত্রী মেম সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে একটা লোমশ কটা রঙের বিড়াল-ছানা নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল। মেঘমালার বাড়ীর কেউ বিড়াল দেখ্‌তে পারে না। মেঘমালার মা শুনেছেন যে, বিড়ালের ছোঁয়াচ থেকে ডিপ্‌থিরিয়া রোগ হয়, বিড়ালের লোম পেটে গেলে যক্ষ্মা হয়। মেঘমালার ঠাকুরমা ...দাই আশঙ্কা, লোভী বিড়াল কখন বা তাঁর ছেলের খাবারে মুখ দেবে, আর কখন বা ঠাকুরের নৈবেদ্যই উচ্ছিষ্ট ক'রে রাখ্‌বে। মেঘমালার পিতার বিড়ালটার উপর রাগ এইজন্য যে, হতভাগ্য বিড়ালটা তাঁর ঘরের বনাত-ঢাকা টেবলটার উপর রাত্রে শুয়ে থাকে আর টেবলটাকে লোমে

লোমাকীর্ণ ক'রে রাখে, ঘরে অন্য অনেকগুলো গদীমোড়া চেয়ার থাকতেও বিড়ালটা ঠিক তাঁরই বসবার চেয়ারটা দখল ক'রে দিব্য কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রা যায় এবং প্রত্যহ তাঁকে সেই বিড়াল তাড়িয়ে চেয়ারে বসতে হয় এবং বিড়ালের বসা জায়গায় বসতে গা ঘিন-ঘিন করে! অন্য চেয়ার-গুলিতে কালেভদ্রে কোনো আগন্তুক এসে বসে, কিন্তু মেঘমালার বাবার চেয়ারটি নিত্য উপবেশনে বেশ গরম হয়ে থাকে ব'লে বিড়ালের তারই প্রতি বিশেষ পক্ষপাত হয়, কিন্তু এটা গৃহস্বামী বর্দাস্ত করতে পারে না। একে বিড়াল, তাতে এটার যা না চেহারাব ছিরি—কটা!—যেন ছাই-মাথা সন্ন্যাসী!

বিড়ালটি কিন্তু মেঘমালার বড় আদরের—বাড়ীর সকলেরই হতশ্রদ্ধার পাত্র ব'লে তাকে মেঘমালা পরের বাড়ীতে আশ্রিত গলগ্রহ মাতার দুরন্ত সন্তানেব মতন সর্ব্বদাই আগ্‌লে আগ্‌লে বাখে; বাড়ীর লোকে যত দূবছাই করে, তার স্নেহ তত বিড়ালটিকে শতপাকে পরিবেষ্টন করে থাকে। মেঘমালা দেখছে, বিডালটা আদর পাবার আশায তার মায়ের গাযে গা ঘষ্‌তে গেছে, মা তাকে পা দিযে লাথি মেরে দূরে ফেলে দিয়েছেন, বাবাব গাযে গা ঘষেছে, বাবা চুপ ক'রে বসে থেকেছেন, তাঁর প্রফুল্ল মুখ ও উজ্জ্বল চোখ দেখে মনে হয়েছে, মূক পশুর স্নেহপ্রার্থনা তাঁব মন্দ লাগছে না, কিন্তু তার স্পর্দ্ধা বেড়ে যাবার আশঙ্কায় তিনি আডষ্ট হযে ব'সে থেকে তাকে উপেক্ষা করেছেন; আর ঠাকুরমার ত্রিসীমানায় তো বিড়ালেব যাবার উপায নেই—অশুচি জীব শৌচাচার

কিছু জানে না, তাকে স্পর্শ করলে তো নাইতে হয়, ষষ্ঠীর বাহন না হলে এই পাঁচমুখোকে ঝাঁটা মেরে তিনি বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিতেন। মেঘমালার মন সকলের অনাদরের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য বিড়ালটির প্রতি মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। আর থাকবেই বা না কেন? এ তো আর যে-সে দেশী বিড়াল নয়, এ একেবারে Persian Cat, মেম-সাহেবের কাছ থেকে আনা!

এক দিন মেঘমালা ইউনিভার্সিটি থেকে এসে তার বিড়ালকে বাড়ীতে দেখতে পেলে না। সে তার আদরের বিড়ালের নাম রেখেছে রুস্তমজী— পারস্যের বিড়ালের নামটা পার্সী হওয়া তো চাই। মেঘমালা রুস্তমজীকে খোঁজবার জন্য ছাদে গিয়ে দেখলে—পাশের বাড়ীর একটি যুবকের কোলে রুস্তমজী দিব্য আরামে বিরাজ করছে! এই যুবকটিকে সে পাশের বাড়ীতে অনেকবার দেখেছে, ইউনিভার্সিটিতেও দেখেছে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাকে কোনো দিন দেখেও দেখে নি। আজ তার কোলে রুস্তমজীকে দেখেই মেঘমালার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল, সে আনন্দোজ্জ্বল চোখে তার দিকে চাইতেই তাকে একবারে দেখার মত দেখা হয়ে গেল—যাকে বলে শুভদৃষ্টি। মেঘমালা ভাবলে, আমার রুস্তমজীকে উনি আদর করেন, ভালোবাসেন,—নিশ্চয় উনি লোক খুব খাসা! যুবকটি রুস্তমজীকে কোলে ক'রে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ছাদে পায়চারী করছিল। মেঘমালা তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার দিকে চেয়েই মেঘমালার ঠোঁটের উপর প্রতি-

পদের চন্দ্রলেখার মতন একটি হাসির রেখা বুলিয়ে গেল, আর সেই হাসির আভা যুবকের মুখের উপর প্রতিফলিত হলো। মেঘমালা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল, আর যুবকটি আগের মতন ছাদে পায়চারী করতে করতে অধিকতর আদরের সঙ্গে রুস্তমজীর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মেঘমালা কলেজের কাপড়-জামা বদ্‌লে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বস্‌ল। রোজ তার খাবার সময় রুস্তমজী হাজির থাকে এবং তার খাবারের ভাগ নিয়ে তবে তার কাছ ছাড়ে। আজ সে গরহাজির। অন্য দিন ইউনি-ভার্সিটি থেকে বাড়ীতে ফিরে রুস্তমজীকে কোলে ক'রে নিয়ে না এসে সে খেতে বস্‌ত না; কোন দিন রুস্তমজী অনুপস্থিত থাক্‌লে মেঘমালা ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌ত। কিন্তু আজ সে প্রসন্নমনে প্রফুল্ল-বদনে ব'সে একলাই খাবার খাচ্ছে দেখে তার ঠাকুরমা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ লো মালা, তোর সোহাগের হনুমানজী আজ কোথায় আছেন? আজ যে বড় আদর কাঁড়াতে আসেন নি এখনো?

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—বাবু সাহেব কোথায় হাওয়া খেতে গেছেন, আমি আর রোজ রোজ খোঁজ খোঁজ ক'রে বেড়াতে পারিনে।

ঠাকুরমা নাতনীর মুখে এই নূতন কথা আর নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্নতা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন।

মেঘমালা নিজের খাবারের অবশিষ্ট খানিকটা রুস্তমজীর জন্য ঢেকে রেখে দিলে।

তাই দেখে মা বল্‌লেন—ওটুকুন তুই খেয়ে ফেল্, হুতুমথুমো বেড়িয়ে ফিরলে তখন তাকে অন্য কিছু খেতে দিস্।

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—না মা, আর আমি খাব না, সেই এসে খাবে।

সন্ধ্যার একটু আগে রুস্তমজী বাড়ী ফিরে মেঘমালাকে গম্ভীর স্বরে ডাক্‌লে—ম্যাওও!

মেঘমালা সেই ডাক শুনেই চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি হাতের সেলাই ফেলে রুস্তমজীকে কোলে তুলে নিলে এবং কৌতুকপ্রফুল্ল স্নেহার্দ্র অনুযোগের স্বরে বল্‌লে—বাঁদর, কেবল আদর খেয়েই কি পেট ভর্‌বে? কিছু খেতে হবে মনে থাকে না?

রুস্তমজী তখন পরম সুখে মেঘমালার কোলের মধ্যে ঘড়র-ঘড়র ক'রে নাক ডাকাচ্ছিল, সে তার মাতার আদরে খুসী হয়ে আবার ডাক্‌লে—ম্যাওও!

মেঘমালা রুস্তমজীকে কোলে ক'রে নিয়ে গিয়ে খাবারের কাছে ছেড়ে দিলে এবং খাবারের ঢাকা খুলে দিলে। রুস্তমজী একবার খাবারটা শুঁকে গোঁফ ঝাড়া দিলে এবং খাবার ছেড়ে ল্যাজ উঁচু ক'রে মেঘমালার পায়ে গা ঘ'ষে ঘ'ষে তাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগ্‌ল।

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—হুঁ, নেমন্তন্ন খেয়ে আসা হয়েছে দেখ্‌ছি! গণ্ডেপিণ্ডে গিলে আর ক্ষিদে নেই! আমি নিজে না খেয়ে মুখের গ্রাস তোর জন্যে রাখ্‌লাম, তোকে খেতেই হবে, খা বল্‌ছি।

মেঘমালা রুস্তমকে ধ'রে আবার খাবারের থালার উপর মুখ গুঁজে

দিলে। রুস্তম এবার খাবারের উপরটা একটু চেটে গোঁফ ঝাড়া দিয়ে প্রচণ্ড আপত্তি জানালে—ম্যাওঁও!

মেঘমালা হেসে রুস্তমকে লুফে কোলে তুলে নিয়ে চঞ্চল লীলাভরে নিজের ঘরে চ'লে গেল। একটা লোক অন্ততঃ আমার রুস্তমকে ভালো বাসে, এই ভেবে তার মন খুসীতে ভ'রে উঠেছিল।

সেই দিন থেকে মেঘমালার মন সেই অপরিচিত যুবকটির দিকে আকৃষ্ট হলো। আগেও সে অনেকবার তাকে দেখেছে, কিন্তু এখন তাকে দেখ্‌লেই বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন স্বচ্ছসলিল সরোবরের মতন মেঘমালার চোখ দুটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, সেই যুবকের চেহারা ও চালচলনের অনেক খুঁটিনাটি এখন তার নজরে পড়ে, তার সঙ্গে চোখোচোখি হ'লে মেঘমালার মুখের উপর এখন ব্রীড়া ক্রীড়া করে। ইউনিভার্সিটীতে গিয়ে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে যাবার পথে মেঘমালার দৃষ্টি যুবকের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে; কোনো দিন দেখা হয়ে গেলে পরিচয়-স্বীকারের শ্রী তার মুখখানিকে মাধুর্যমণ্ডিত ক'রে দিয়ে যায়। এখন মেঘমালা দেখে, যুবক রোজ ভোরে উঠে ছাদে ডাম্বেল মুগুর নিয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা ব্যায়াম করে; তার পর স্নান ক'রে সিঁড়ির উপর চিলের ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে পূজা-পাঠ করে; তার পর তার চাকর ছোলা আদা আর এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসে, তাই খায়—চা খায় না। দশটায় সময় ভাত; বিকালে ফল ছানা ক্ষীর সন্দেশ; আর রাত্রে লুচি মাংস আহার করে। লোকটার খাওয়ার পরিপাটী আছে, সব পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন, আর খেতেও পারে খুব। তার প্রত্যেকবার খাওয়ার সময় রুস্তমজী গিয়ে জোটে, আর খাবারের ভাগ আদায় ক'রে নিয়ে আসে।

একদিন গভীর রাত্রে মেঘমালা চম্‌কে ঘুম থেকে জেগে উঠল— ভারি মিঠা চড়া গলায় কে গান গাচ্ছে আর তার সঙ্গে অতি মিষ্টি এসরাজের সুর মিশে আস্‌ছে। মেঘমালার মনে হলো, পাশের ঐ বাড়ী থেকেই গান ভেসে আস্‌ছে। অল্পক্ষণ কান পেতে শুনে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়্‌ল, ধীরে ধীরে ছাদে চল্‌ল। এত দিন ঐ বাড়ীতেই সেই অনামা যুবক আর তার বামুন, চাকর, দরোয়ান ছাড়া আর কোনো লোককে তো মেঘমালা দেখে নি; কোনো স্ত্রীলোক সে বাড়ীতে থাক্‌লে তো মেঘমালা তার সঙ্গে কবে আলাপ কর্‌ত; আজ এই গভীর রাত্রে সেই বাড়ীতে রমণীকণ্ঠের গান এল কোথা থেকে? জান্‌বার জন্য কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠাতে মেঘমালা ছাদে গেল। যদিও সে দিন কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি, তথাপি তখন চাঁদ উঠেছে আর খণ্ড চাঁদের ভাঙা বুকের জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাসে আকাশে পৃথিবীতে গলা রূপার প্লাবন খেলা করছে। সেই জ্যোৎস্নায় ছাদের উপর একখানি জাপানী মাদুর পেতে ব'সে সেই যুবক তন্ময় হয়ে গান গাচ্ছে! আহা, পুরুষমানুষের এমন মিঠা মিহি গলা! যেন বীণার তার থেকে ঝঙ্কার বেরুচ্ছে, সব কথাগুলি সুস্পষ্ট, গানের কোনো বাক্য আর এক শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে না, অথচ একটী শব্দের সুর অপর শব্দের সুরের দিকে গড়িয়ে চলেছে

ঊর্মি-লহরীর বিচিত্র লীলায়। মেঘমালা মুগ্ধ হ'য়ে যুবকের গান শুন্‌তে লাগ্‌ল। সে গাচ্ছে—

"যব-সে লাগী তেরি আঁখিয়াঁ।
দিল্ হো গেয়া দিবানা!
তুম্ লয়লা হো—মৈঁ মজনু,
তুম্ শিরীঁ হো—মৈঁ খস্‌রু,
তুম্ গুল্ হো—মৈঁ বুল্‌বুল,
তুম্ শামা হো—মৈঁ পর্‌বানা!"

যুবকের গান থেমে গেল। সে কোলের উপর এস্‌রাজটীকে শুইয়ে রেখে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে চাঁদের উপর দিয়ে পাতলা মেঘ ভেসে যাওয়া দেখতে লাগ্‌ল। মেঘমালা গানের সুরে ও কথায় মন ভরে নিয়ে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে নীচে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল।

এই যুবকটীর নাম ও পরিচয় জান্‌বার জন্য মেঘমালার মন উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল ; কিন্তু উপায় কৈ—উপায় কৈ ?

এর পর যখনই সেই যুবকের উপর মেঘমালার চোখ পড়ে, তখনই তাকে দেখার মতন দেখা হয়ে যায়—সে সরু পাড়ের খদ্দর কাপড় পরে, কাপড় চাকর কুঁচিয়ে দেয়, কোঁচার চুনট-করা ফুল বার্ণিশ-করা চটী জুতার উপর দোল খায় ; ফর্সা কপালের এক পাশে একটা তিল আছে, হাতের কব্জীতে একটা কাটা দাগ—

একদিন বিকাল-বেলা ছাদে গিয়ে মেঘমালা দেখ্‌লে, সেই যুবক

মালকোঁচা মেরে আর এক জন অল্পবয়সী ছোকরার সঙ্গে খুব ধূম ক'রে ছোরা খেল্‌ছে—দুজনেরই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা, অসামান্য চাতুর্য। তখন মেঘমালা বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, হাতের কব্জীতে ঐ কাটা দাগটা কেন। মেঘমালা মুগ্ধ প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাদের খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। যুবক কেবল বলিষ্ঠ সুপুরুষ নয়, সে গুণী গায়ক, আবার বীরও। মেঘমালার মন যুবকের প্রতি শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠ্‌ল।

তারপর থেকে রোজই দেখে, বিকালে সেই কিশোর ছেলেটী আসে, আর যুবার সঙ্গে ছোরা, লাঠি, তরোয়াল খেলে, বক্‌সিং করে, কিংবা জিউজুৎস্থর প্যাঁচ লড়ে। দুচার দিন দেখেই মেঘমালা বুঝ্‌লে যুবক শিক্ষক আর কিশোর তার কাছে শিক্ষার্থী।

সে দিন বিকালে মেঘমালার বাবা বাড়ীতে ছিলেন না। মেঘমালা বাইরের ঘরে গিয়ে বস্‌ল—তার মনে যেন আজ কি একটা দুষ্কর সঙ্কল্প রয়েছে—সে আজ অসাধ্যসাধন একটা কিছু ক'রে ফেল্‌বে।

উৎসুক অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ব'সে থাকার পর পিয়ন চিঠি বিলি করতে এল। মেঘমালার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল—এই পিয়নের আগমনই সে অপেক্ষা কর্‌ছিল। সে জান্‌ত, আজ তার চিঠি আস্‌বেই—সে আজ কদিন হ'লো, তার চেনা জানা যে যেখানে আছে, সবাইকে চিঠি লিখেছিল, তাদের কেউ না কেউ জবাব দেবেই, আর সেই চিঠি দিতে পিয়ন তাদের বাড়ীতে আস্‌বেই।

পিয়ন পাঁচ-ছখানা চিঠি মেঘমালার হাতে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল।

মেঘমালা একটা ঢোক গিলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা পিয়ন, এই পাশের ৪৬নম্বর বাড়ীতে কে থাকেন ?

এই প্রশ্নটার কথা কয়টা বেরিয়ে যেতে যেন মেঘমালার গলায় বেধে গেল, সে মুখ ফিরিয়ে একবার কাশ্‌লে, আর এই বিষম খেয়ে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল।

পিয়ন বল্‌লে—ও বাড়ীতে শুধু এক বাবু থাকেন, তাঁর নাম ফাল্গুনী চৌধুরী, রাজসাহীর এক জমিদারের ছেলে, এখানে পড়েন, তাই বাসা ক'রে আছেন।

মেঘমলা উদাসীনতার ভাণে বল্‌লে—ও।

পিয়ন চ'লে গেল।

মেঘমালার মুখ লজ্জারুণ হয়ে উঠ্‌ল, পরক্ষণেই খুশীর আভায় উজ্জ্বল হলো। সে ভাব্‌লে—যাক নামটা পাওয়া গেল। খাসা নতুন নাম—ফাল্গুনী! ফল্গু—ফাগুন—আগুন—গুণ সবই সে তার নামে ধ'রে রেখেছে! বাঃ!

মেঘমালা যতই ভেবে ভেবে ফাল্গুনীর নাম বিশ্লেষণ করছিল, ততই অর্থমাধুর্যে তার মন ভ'রে উঠ্‌ছিল।—এ ফাল্গুনী অর্জুনের মতন বীর, সব্যসাচী; সে কবি যুবা, ফাগুন বসন্ত তো তার সখা; ফল্গুধারার মতন কত গুণ তার অন্তরে লুকিয়ে আছে; আর সে উজ্জ্বল পাবক আগুন—আমার মন-পতঙ্গের ?

এই কথা মনে হতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল আর তার অন্তরে ফাল্গুনীর মুখ থেকে শোনা স্বরের গুঞ্জরণ জাগ্‌ল—

"তুম্ শামা হো—মৈঁ পরবানা ?"

মেঘমালা ফাল্গুনীর নামের মাধুর্য্যরসে এমন নিমগ্ন হয়ে গেল যে, যে-সব চিঠির প্রত্যাশায় সে বাইরের ঘরে এসে ব'সে ছিল, সেই-সব চিঠি তার কোলের উপর উপেক্ষিত হয়ে প'ড়েই রইল, খুলে পড়্‌বার কথা তার মনেও পড়্‌ল না। তার মনের মধ্যে এই কথাই বারংবার গুঞ্জরণ ক'রে ফির্‌ছিল—খাসা নাম। খাসা নাম ! বেশ নামটী !

সঙ্গে সঙ্গে তার মন জুড়ে এই গানটী ঘুরে ঘুরে নেচে ফির্‌তে লাগ্‌ল—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম !
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ !
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে-বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতি-ধরম কৈছে রয় ॥

পাসরিতে চাই মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কুলবতী-কুল-নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

মেঘমালা রসাবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ ব'সে ছিল, হঠাৎ সে কার স্পর্শ পেয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল—রুস্তমজী তার পায়ে গা ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে ডাক্‌ল—মাঁওঁওঁ!

মেঘমালার ধ্যানভঙ্গ হলো, সে স্মিতমুখ নত ক'রে স্নেহক্ষরিত দৃষ্টিতে রুস্তমজীর দিকে তাকিয়েই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—বা রে রসিকচাঁদ, আবার গহনা পরা হয়েছে! দেখি, দেখি—

মেঘমালা হেঁট হয়ে রুস্তমজীকে কোলে তুলে নিলে, রুস্তমজীর গলা অমনি আনন্দের রসস্রোতে ঘড়ঘড় কর্‌তে লাগ্‌ল।

মেঘমালা দেখ্‌লে—রুস্তমজীর গলায় রূপার একছড়া বিছাহারের সঙ্গে এক ছোলো রূপার ঘুঙুর কে পরিয়ে দিয়েছে! কে আর পরিয়ে দেবে?—যে দেবার, সেই দিয়েছে! অম্‌নি মেঘমালা হেসে ফেল্‌লে যেই তার মনে হলো—Love me and love my cat!

মেঘমালা রুস্তমজীর গলার ঘুঙুরগুলি নাড়াচাড়া কর্‌ছিল আর ভাব্‌ছিল। সে দেখ্‌লে, ঘুঙুরগুলি একটি বড় মাদুলীর গা দিয়ে লাগানো। মাদুলীটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘমালা দেখ্‌তে পেলে, তার এর মুখের চাকৃতির এক পাশে একটা ছোট কব্জা আছে। কব্জা যখন

আছে, তখন ওটা নিশ্চয় খোলা যায়। ঢাকৃনি খোল্‌বার উপায় অনুসন্ধান কর্‌তে মনোযোগ দিতেই দেখ্‌লে, কব্জার উল্টা দিকে একটা ছোট্ট টেপা ক্লিপ আছে। সেই ক্লিপে টিপ দিতেই স্প্রিং-দেওয়া ঢাকৃনি ছিট্‌কে খুলে গেল। মাদুলীটা ফাঁপা। তার মধ্যে একটা সরু কাগজ কুণ্ডলী পাকিয়ে গুটানো আছে। সেই কাগজের কুণ্ডলী বার ক'রে পাক খুলে মেঘমালা দেখ্‌লে—সরু কলম দিয়ে কাগজের উপর লেখা আছে—

"প্রপন্নার্ত্তি-হরে দেবী প্রসীদ ময়ি শঙ্করি !"

ঐ লেখাটি প'ড়েই মেঘমালার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল, সে রুস্তমকে বল্‌লে—খাসা রক্ষাকবচ পেয়েছিস। তোর সকল রিষ্টি কেটে গেল! এত আদরও তোর কপালে ছিল? আমি ভাব্‌তাম, তুই বুঝি কেবল লোকের চক্ষুশূল!

মেঘমালা রুস্তমজীকে কোলে তুলে হাসি-মুখে উপরতলায় যেতেই ঠাকুরমা তাদের দেখে বল্‌লেন—বা! ছেলের গলায় আবার গহনা গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে!

কত সাধ যায় লো চিতে—
মলের আগায় চুট্‌কি দিতে!

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—তা ঠাকুরমা, হিংসে করো না, তোমার নাতজামাই যখন আস্‌বে, তখন তাকে বল্‌ব, তোমার পায়ে ঘুঙুর দেওয়া

নূপুর পরিয়ে দেবে, আর তুমি চন্দ্রাবলী হয়ে আহ্লাদে নৃত্য করবে, সে গান ধরবে—

রুমঝুম, রুমঝুম কে এলে
নূপুর পায় !
ফুটিল শাখে মুকুল
ও-রাঙা চরণ-ঘায় !

মেঘমালা সুর ক'রে গান ধরেছিল। তার ঠাকুরমার সঙ্গে রসিকতার কথা শুনেই তার মা ও বাবা দুজনে পাশের ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। মেঘমালা তাঁদের দেখেই লজ্জা পেয়ে এবং জিভ কেটে গান থামিয়ে ফেলে হাসতে লাগল।

ঠাকুরমা মেঘমালার গানের উত্তরে বললেন—দেখা যাবে লো দেখা যাবে! তোর পায়ে নূপুর পরিয়েই তোর বর অবসর পাবে না, তা আবার আমায় পরাবে ?—

মেঘমালা বাপ-মার সামনে আর কোনো জবাব দিল না, কাজেই ঠাকুরমার রসিকতাও আর জমল না।

মেঘমালার মা হাসতে হাসতে বললেন—এর জন্যই বুঝি সে দিন আমার কাছ থেকে স্কলারশিপের টাকাগুলো চেয়ে নিলি? তা বেশ হয়েছে, ঐ গহনার লোভে তোকে সুদ্ধ কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যাবে, আপদ যাবে।

মেঘমালার মন আজ খুশীতে ভ'রে উঠেছিল, কাজেই মায়ের কথা শুনেও তার মুখ ম্লান হলো না—হাস্তেই লাগ্ল।

তার বাবা জিজ্ঞাসা কর্লেন—আমাদের সেকরা তো কৈ আনে নি? এ গহনা কে গড়িয়ে দিলে?

মেঘমালা মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে—আমার এক বন্ধু। এই কথা ব'লেই তার মুখ আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্ল।

ঠাকুরমা বল্লেন—শিগ্গির শিগ্গির একটা বিয়ে কর। তোর খোকা হ'লে তাকে সাজাস। ও-মুখপোড়াকে সাজিয়ে কি হবে?

ঠাকুরমার কথায় লজ্জা পেয়ে মেঘমালা সেখান থেকে পলায়ন করল। সে নিজের ঘরে গিয়ে রুস্তমজীকে কোলে নিয়ে বস্ল এবং এক টুক্রা কাগজে লিখ্লে—

প্রসন্নোহস্মি রে ভক্ত, বরং বৃণু।

তার পর রুস্তমজীর গলার মাদুলী থেকে ফাল্গুনীর লেখা কাগজের কুণ্ডলীটা বাহির ক'রে নিয়ে তার নিজের লেখা কাগজটুকু কুণ্ডলী পাকিয়ে মাদুলীর মধ্যে বন্ধ ক'রে দিলে।

মেঘমালা রুস্তমজীকে কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে হাসিমুখে আদর ক'রে বল্লে—রুস্তু, যাও, একটু বেড়িয়ে এসো গে।

রুস্তমজী আদর পেয়ে মেঘমালার পায়ে গা ঘষ্তে ঘষ্তে ডাকৃতে লাগল, সে তাকে ছেড়ে যেতে চায় না।

বন-জ্যোৎস্না

মেঘমালা আদরভরা এক চাপড় মেরে রুস্তমকে বল্‌লে—যাও না দস্যি, নড়ো না—

রুস্তম আদরের চাপড়ে কৃতার্থ হয়ে ডাক্‌লে—"ম্যাও।" তার পর তার লেজ তুলে ঘুরে ফিরে মেঘমালার পায়ে গা ঘষা চল্‌তে লাগ্‌ল।

রুস্তম স্বেচ্ছায় নড়ে না দেখে মেঘমালা তাকে কোলে ক'রে ছাদে নিয়ে গেল এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছাদের আল্‌সে ডিঙিয়ে রুস্তমকে পাশের বাড়ীর ছাদে ফেলে দিলে।

রুস্তম তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে পার হয়ে ফিরে এসে মেঘমালার পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লে—ম্যাওঁ!

রুস্তমের অবুঝ অবাধ্যতা দেখে মেঘমালার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল এবং সে নিজের অপ্রসন্নতায় কৌতুক অনুভব ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে নীচে চ'লে গেল আর রুস্তমও তার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এল।

মেঘমালা বুঝ্‌লে যে, তার গরজ যতই প্রবল থাক রুস্তমের মর্জির উপরই তাকে নির্ভর ক'রে থাক্‌তে হবে। সে রুস্তমকে চোখে চোখে রেখে ফির্‌তে লাগ্‌ল এবং একান্তমনে কামনা কর্‌তে লাগ্‌ল যে, রুস্তম পাশের বাড়ীতে বেড়াতে যাক—যাক। কিন্তু রুস্তম আর তার সঙ্গ ছেড়ে নড়ে না।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় পাশের বাড়ীতে পিঁড়ি পাতার শব্দ শোন্‌বামাত্রই রুস্তমজী এক ছুট দিয়ে চ'লে গেল।

রুস্তম যে-বাড়ীর প্রতিপালিত সে-বাড়ীর খাবার জায়গার ত্রিসীমানায়

ঘেঁষ্‌তে পারে না, অন্ত্যজ অস্পৃশ্যের মতন তাকে একলা একধারে খেতে হয়। কিন্তু পাশের বাড়ীতে সে ভোক্তার সঙ্গে সমানে হ'য়ে ব'সে খাবারের তুল্য ভাগ পায়, তাই তার পাশের বাড়ীতে খেতে যেতে এত আগ্রহ। পিঁড়ি পাতার কি জলের গ্লাস রাখার শব্দ কানে গেলেই শ্যামের বংশীরবে আকৃষ্ট শ্যামলী-ধবলীর মতন পুচ্ছ তুলে রুস্তমজী দৌড় মারে।

রুস্তমজীর ছোটা দেখে মেঘমালার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল এবং রুস্তমের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় তার মন উৎসুক হয়ে রইল।

রুস্তমজী নটার পরে বাড়ী ফির্‌ল।

তাকে দেখেই মেঘমালা লুফে কোলে তুলে নিলে এবং তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চ'লে গেল। সেখানে গোপনে রুস্তমজীর মাদুলী খুলে কাগজ বা'র ক'রে দেখ্‌লে, জবাব এসেছে—

আয়ুর্‌ নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং
যাতি ক্ষয়ং যৌবনং,
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্‌ ন দিবসাঃ
কালো জগদ্‌ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্‌ তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা
বিদ্যুচ্চলং জীবনং,
তস্মান্‌ মাং শরণাগতং শিবকরি
ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥

অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বম্ এব শরণং মম।
তস্মাৎ করুণভাবেন রক্ষ রক্ষ শুভঙ্করি॥

মেঘমালা পরম কৌতুক অনুভব ক'রে তখনই উত্তর লিখ্‌লে—

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বক্ষোভেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এবং সেই কাগজটুকু পাকিয়ে রুস্তমের গলার মাদুলীতে ভ'রে রাখ্‌লে—কখন সে পাশের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে, তা তো বলা যায় না। আর রুস্তমজী তো এ বাড়ীর সকলের অস্পৃশ্য, কাজেই এই রক্ষাকবচের মন্ত্র কারও কাছে ধরা পড়্‌বার সম্ভাবনা নেই। মেঘমালা এই এক কৌতুককর খেলায় মেতে উঠেছিল, তার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল, রুস্তম আজই রাত্রে আবার পাশের বাড়ীতে যাক্ এবং আর একটা কিছু উত্তর নিয়ে আসুক! কিন্তু জগতে সকল ইচ্ছাই তো পূর্ণ হয় না।

পরদিন প্রভাতে সে দেখ্‌লে, রুস্তমজী দুধের ভাগ পাবার লোভে আগে থাকতেই ফাল্গুনীর পূজার আসনের পাশে গুটিসুটি হয়ে ব'সে আছে। ফাল্গুনী তাকে দুধ খাইয়ে কোলে ক'রে নিয়ে নীচে নেমে গেল! সিঁড়ির উপর আলো আস্‌বার একটা ঘুলঘুলি দিয়ে ঐ ব্যাপার দেখে মেঘমালার বুকের মধ্যে হৃদয়টি ধক্‌ধক্ করতে লাগ্‌ল।

রুস্তম ফিরে আস্‌তেই মেঘমালা তাকে সিঁড়িতেই গ্রেপ্তার করলে এবং নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাদুলী খুলে পড়্‌লে—

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ ত্বাং সংযাচে শুভদে, জননং যাতু মম বৈ
দেবী মেঘমালা জয় জয় জয়ন্বিতি জপতঃ ॥

এই প্রার্থনা পাঠ ক'রে এবং প্রার্থনার ত্বাং সংযাচে (তোমায় যাচ্ঞা করি) কথা দুটির নীচে লাল-কালীর যুগল রেখা টানা দেখে মেঘমালার মন লজ্জায় ও আনন্দে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল যে, সে আর এ লেখার খেলা চালাতে পার্‌লে না ; সে একটু কাগজ ছিঁড়ে তার উপর কেবল লিখ্‌লে—

তথাস্তু !

সে দিন ইউনিভার্সিটিতে যাবার আগে মেঘমালা কিছুতেই কুস্তমজীকে পাশের বাড়ীতে পাঠাতে পার্‌লে না। সে উদ্বিগ্নচিত্তে ইউনিভার্সিটিতে চ'লে গেল এবং তার মন বন্দী হয়েই রইল কুস্তমজীর গলার মাদুলীর মধ্যে।

সে বাড়ীতে ফিরে এসেই দেখ্‌লে, মাদুলীর মধ্যে তার এক-শাব্দিক পত্রের উত্তর একটি শব্দেই ফিরে এসেছে—

স্বস্তি !

মেঘমালা ঐ কাগজটুকু কুস্তমজীর মাদুলীর মধ্যেই রেখে দিলে—আর তার লেখ্‌বার কিছু নেই।

মেঘমালা বিকাল-বেলা আশ্চর্য হয়ে দেখ্‌লে ফাল্গুনী এসে তাদের বাড়ীতে ঢুকল। তাদের ভৃত্য ফাল্গুনীকে দেখেই তাড়াতাড়ি তার কাছে গেল। ভৃত্যের তটস্থ সম্ভ্রমের ভাব দেখে মেঘমালার মনে হলো, ফাল্গুনী তার কাছে অপরিচিত নয়, সে হয় তো ফাল্গুনীর ভৃত্য ও পাচকের সঙ্গে পরিচয়-প্রসঙ্গে বাবুরও পরিচয় পেয়ে রেখেছে।

ফাল্গুনী একটু অপ্রতিভভাবে স্মিতমুখে ভৃত্যকে বল্‌লে—তোমার বাবুকে বলো, পাশের বাড়ীর বাবু দেখা কর্‌তে এসেছেন।

ভৃত্য এসে কর্তাকে খবর দিলে।

মেঘমালার পিতা নীচে নেমে গিয়ে বৈঠকখানায় যেতে যেতে স্মিতমুখে দূর থেকেই অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লেন—আসুন, আসুন, এই ঘরে আসুন—

ফাল্গুনী প্রথম পরিচয়ের লজ্জার সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হয়ে মেঘমালার পিতাকে প্রণাম কর্‌লে এবং নম্রস্বরে বল্‌লে—আমি আপনার ছেলের মতন আমাকে আপনি 'আপনি' বল্‌বেন না।

মেঘমালার পিতা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, তুমি অভয় দিলে 'তুমি' বল্‌তে পারি।—

তাঁরা ঘরের ভিতর প্রবেশ কর্‌লেন।

উপর থেকে নীচে নাম্‌বার সিড়ির ঠিক পাশেই বৈঠকখানা, আর তার পাশের বাড়ী থেকে বাইরে পথে বেরোবার দরজা; বৈঠকখানার পাশে কোনো ঘর নেই; কাজেই ফাল্গুনীর সঙ্গে পিতার কি কথাবার্তা

হচ্ছে জানবার কৌতূহল মেঘমালার মনে প্রবল হ'লেও তাকে তা দমন ক'রে থাকতে হলো ; তার যদিও বৈঠকখানার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কথাবার্ত্তা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছিল, তথাপি চাকর-দাসীদের কাছে ধরা পড়বার লজ্জায় সে কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ পরে মেঘমালা দেখলে ফাল্গুনী প্রফুল্লমুখে বেরিয়ে গেল এবং যাবার সময় তার উৎসুক দৃষ্টি একবার চারিদিকে বুলিয়ে কাকে যেন দেখতে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ ক'রে গেল।

মেঘমালা তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার উল্টা দিকের বারান্দার থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে তার মায়ের কাছে গিয়ে বসল হাতে একটা সেলাই নিয়ে।

মেঘমালা যা প্রত্যাশা করেছিল, তাই ঘটল, তার বাবা হাসিমুখে সেখানেই এসে উপস্থিত হলেন এবং কন্যাকে বললেন—বুড়ী, এই পাশের বাড়ীতে যে ছেলেটি থাকে, সে এসেছিল আমার সঙ্গে আলাপ করতে। তুই তাকে চিনিস ?—

পিতার এই প্রশ্নে মেঘমালার মুখ লজ্জায় রাঙা টকটকে হয়ে উঠল, তার মনে হলো—বাবার এ প্রশ্নের মানে কি, ফাল্গুনী কি বাবার কাছে আমার কথা কিছু ব'লে গেল না কি ?

মেঘমালা কি উত্তর দেবে, এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ ক'রে স্থির করবার পূর্ব্বেই তার বাবা নিজের কথার উপসংহার করলেন—ইউনিভার্সিটিতে সেও এম-এ পড়ে, সংস্কৃতে—

মেঘমালা সেলাইয়ের ফোঁড় তুল্‌তে তুল্‌তে নত নেত্রে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—না।

তার এই লজ্জা ও কুণ্ঠা যে অশোভন হচ্ছে, তা সে বুঝ্‌তেই পারছিল না।

তার বাবা বলতে লাগ্‌লেন—অদ্ভুত রকমের ছেলেটি; বি-এস-সি পাশ ক'রে বোমার মামলা আর স্বদেশী ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে দু'বচ্ছর ইন্টার্ণড্‌ হয়েছিল। সেই সময়ে ইংরেজী সংস্কৃত ফিলজফী ইত্যাদি খুব পড়ে। তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না থাকাতে খালাস পায়। তখন আবার বি-এ পাশ করে। এখন সংস্কৃততে এম-এ পড়্‌ছে।

মেঘমালার মন ফাল্গুনীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠ্‌ল। তার বাবাকে সহস্র প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু কেন যে তার এত লজ্জা, তাই সে ভালো বুঝে উঠ্‌তে পারছিল না।

তার মা প্রশ্ন করলেন—ছেলেটিকে তো আমি দেখেছি, দিব্যি দেখ্‌তে, সভ্যভব্য। ওদের বাড়ী কোথায়?

মেঘমালার বাবা বল্‌লেন—রাজসাহীতে। আমাদেরই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। জমিদার। বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই। একা—নিজেই নিজের মালিক। সে বল্‌লে—সে যখন গভর্ণমেণ্টের সুনজরে একবার পড়েছে, তখন তার থাকা-না-থাকার স্থিরতা তো কিছু নেই, কাজেই এর মধ্যেই সম্পত্তির উইল ক'রে রেখেছে; যদি অবিবাহিত অবস্থায় বা বিবাহের পর অপুত্রক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তা হ'লে সমস্ত সম্পত্তি

তার গ্রামের ডিস্‌পেন্সারী, ছেলে-মেয়ের স্কুল আর দেশের অন্য অন্য কাজের সাহায্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে; বিধবা স্ত্রী থাক্‌লে তিনি একটা অংশ পাবেন।

মেঘমালার মুখ ম্লান হয়ে উঠ্‌ল।

তার মা বল্‌লেন—বালাই, ষাট! ছেলেটি ক্ষেপা না কি? ছেলে-মানুষ, বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হবার আগেই মরার ভাবনা কেন?

মেঘমালার বাবা বল্‌লেন—এতে তো তার দূরদর্শিতা আর বিচক্ষণ-বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে দিন-কাল পড়েছে! ছেলেটিকে তো আমার খুবই ভালো লাগ্‌ল।—বুড়ী, তুই ওর সঙ্গে আলাপ করবি?—আমি ওকে রবিবার রাত্রে আমাদের সঙ্গে খেতে নেমন্তন্ন করেছি।

মেঘমালার মাথাটা কোলের উপর ঝুঁকে পড়্‌ল—সে সেলাইয়ে কি ভুল ক'রে বসেছে, স্থচ দিয়ে সে সেলাই করা স্থতার ফোঁড় খুল্‌তে ব্যস্ত।

মেঘমালার বাবা কন্যার অবস্থা দেখে তার মনের ভাব অনুভব ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—ফাল্গুনী এসেছিলেন স্নুভদ্রা-হরণের উদ্দেশে; বল্‌লে—আপনি দেশে আর প্রোফেসারদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুন, আমি নেহাৎ অপাত্র ব'লে প্রতিপন্ন হবো না; জীবনে তামাক কি অন্য কোনো নেশা করি নি; সর্দি না হ'লে চা খাই না; বারো বৎসরের মধ্যে একটিমাত্র পান খেয়েছি মনে পড়ে। আমার পিতামহ আর মাতামহ উভয় বংশই নীরোগ বলিষ্ঠ ব'লে বিখ্যাত। আমাদের বংশের

একটা ব্যসন আছে শিকার করা—ছুটির সময় আমিও দেশে গিয়ে শিকার করি।

মেঘমালা পিতার কথায় লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে উঠে চ'লে যাচ্ছিল।

তাকে পলায়নোদ্যত দেখে তার পিতা বল্‌লেন—আর ফাল্গুনী বল্‌ছিল—আপনার কন্যার অসম্মতি হবে না ভরসাতেই আমি নিজে এই প্রস্তাব করতে এসেছি, আর আমার কেউ অভিভাবক নেই ব'লে আমাকে নিজেই আস্‌তে হয়েছে।

মেঘমালা পলায়ন ক'রে নিজের ঘরে গিয়ে লুকাল, তার মন তখন শ্রদ্ধায়, অনুরাগে ও সুখের মোহে আবিষ্ট আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল।

কতক্ষণ সে এইরকম ভাবে বসেছিল তার খেয়ালই ছিল না। তার ঠাকুরমা এসে তার ধ্যান ভঙ্গ কর্‌লেন—কি লো, তুই নাকি স্বয়ম্বরা হয়েছিস ?

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—হিংসে কোরো না ঠাকুরমা, তোমাকেও সতীন ক'রে নেবো।

ঠাকুরমা তার চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে বল্‌লেন—বালাই ষাট, হিংসে করব কেন ভাই, তুই রাজরানী হ, স্বামিসোহাগিণী হ, সতীনতোর শত্রুর হোক।

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—বিনা স্বার্থে কি আমি তোমাকে সতীন কর্‌তে চাইছি, ঠাকুরমা ? একে তোমার বয়সটা নিরাপদ, তাতে

তোমার মতন যত্ন তো আমি করতে পারব না? তুমি আমাদের যত্ন-আদর করবে, আর আমরা পরম সুখে ঘরকন্না করব।

ঠাকুরমা ছলছল চোখে বল্লেন—শিগ্‌গির মালাবদল ক'রে নে ভাই, তোর কোলে একটি সোনার চাঁদ ছেলে দেখে আমি তবে সুখে মরতে পারব।

মেঘমালা কোপ প্রকাশ ক'রে বল্‌লে—যাও ঠাকুরমা, ও-কথা মুখে আন্‌লে তোমার সঙ্গে আড়ি।

ঠাকুরমা নাতনীর স্নেহের পরিচয়ে সুখী হয়ে ঘর থেকে চ'লে যেতে যেতে হেসে ব'লে গেলেন—এই দেখ্‌ ভাই, ভয় পেয়ে আগে থাক্‌তেই আড়ি ক'রে রাখ্‌ছিস্।

* * * * *

রবিবার রাত্রে ফাল্গুনী মেঘমালার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল। আজ সমস্ত দিন ধ'রে মেঘমালার ঠাকুরমা আর মা নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করেছেন, তারই সৌরভে সমস্ত বাড়ীর বাতাস পূর্ণ হয়ে আছে। ফাল্গুনী নিজের বাসা থেকে বিবিধ খাদ্য রন্ধনের গন্ধ সমস্ত দিন পেয়েছে; এখন নিমন্ত্রণের বাড়ীতে এসে সেই গন্ধ তার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু আজ সমস্ত দিন সে মেঘমালাকে একবারও দেখ্‌তে পায় নি; মেঘমালার বাড়ীতে এসে তার চক্ষু চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

মেঘমালার বাবা বাইরের ঘরেই ব'সে ছিলেন। ফাল্গুনীর পদশব্দ

শুনেই তিনি বৈঠকখানার দরজার কাছে এসে প্রফুল্লমুখে বল্‌লেন—এস বাবা, এস। চলো একেবারে ওপরে গিয়ে বসি।

এই ব’লে তিনি অগ্রসর হয়ে উপরে যাবার সিঁড়ির দিকে চল্‌লেন; ফাল্গুনী তাঁর অনুসরণ ক’রে চল্‌ল। মেঘমালার পিতা যে তাকে মেঘমালার কাছ থেকে দুরে রেখে গল্প জুড়ে দিলেন না, এতে ফাল্গুনীর মন বিশেষ সন্তোষ লাভ করল এবং উপরে গেলে যে অবিলম্বে মেঘমালার দর্শনলাভ ঘট্‌বে, সেই আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল।

উপরে উঠেই ফাল্গুনী দেখ্‌লে, একজন প্রৌঢ়া বিধবা ও একজন সধবা বধু দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁদের ফাল্গুনী চিন্‌ত—মেঘমালার ঠাকুরমা ও মা, কিন্তু সেখানে মেঘমালা নেই।

মেঘমালার পিতা ফাল্গুনীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—ফাল্গুনী, ইনি আমার মা, আর উনি মেঘমালার মা।

ফাল্গুনী অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রণাম কর্‌তে কর্‌তে ভাব্‌লে—তা তো হলো, কিন্তু আসল জন কই?

ফাল্গুনী প্রণাম ক’রে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত কর্‌লে, তা দেখে মেঘমালার ঠাকুরমা বল্‌লেন—এস ভাই এস,—ফাল্গুনী এসেছ সুভদ্রা-হরণ কর্‌তে—তোমার মন ভাজা-মাছের গন্ধে বেরালের মতন যার জন্যে ছোঁক-ছোঁক কর্‌ছে, তার সঙ্গে দেখা কর্‌বে এস—সে ছুঁড়িকে কিছুতেই এখানে আন্‌তে পার্‌লাম না।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর হাত ধ'রে টান্তে টান্তে বারান্দার অপর প্রান্তের ঘরের দিকে নিয়ে চল্লেন।

ভাবী শ্বশুরশাশুড়ীর কাছ থেকে একটু দূরে গিয়েই ফাল্গুনী হেসে বল্লে—ঠাকুরমা, প্রথমে তো আপনার পাণিগ্রহ হয়ে গেল! আজ-কালকার কালে বহু বিবাহ কি চল্বে?

তখন তারা ঘরের সাম্নে গিয়ে পৌছেছে। ফাল্গুনী দেখ্লে, মেঘমালা সুখলজ্জায় আরক্তিম স্মিত মুখ নত ক'রে কোলের উপর উপবিষ্ট রুস্তমজীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, সবুজ ঘোম্টা দেওয়া একটা ইলেক্ট্রিক ল্যাম্পের আলো তার কপাল থেকে নাকের ডগা পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে ও তার মুখ ও চিবুক আবছায়ায়।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে কথায় হাসি মাখিয়ে বল্লেন—তা ভাই, বহু বিবাহে যদি অরুচি থাকে তো এখান থেকেই ফিরি।

ঠাকুরমার হাসি-মাখা কথা শুনে মেঘমালা মুখ ঈষৎ তুলে ফাল্গুনীকে দেখেই কোল থেকে রুস্তমকে তাড়াতাড়ি বিছানায় নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ফাল্গুনীকে একেবারে তার ঘরের সাম্নে উপস্থিত দেখে ও ঠাকুরমার রসিকতা শুনে তার মুখ সুখের লজ্জায় আরো লাল হয়ে উঠ্ল।

ফাল্গুনী মেঘমালাকে অনুরাগমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ঠাকুরমাকে হাসিমুখে বল্লে—ঠাকুরমা, আমি গডাচন্দ্র চণ্ডয়ের মত সুবোধ ছেলে—আমি ডুডও খাই টামাকও খাই!

ঠাকুরমা ফাল্গুনীকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—না ভাই, তোমার আর দু-নৌকোয় পা রেখে কাজ নেই।

তার পর তিনি মেঘমালার ডান হাতখানি ধ'রে তার উপর ফাল্গুনীর ডান হাত রেখে দিয়ে বললেন—এই নে মালা, আমার এই প'ড়ে পাওয়া অস্থাবর সম্পত্তিটি আমি তোকে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে সুস্থ শরীরে নিঃস্বত্ব হয়ে একেবারে দান ক'রে দিচ্ছি, এতে অপর কেহ যদি দাবী-দাওয়া বা আপত্তি করে তবে তাহা নামঞ্জুর হয়।

মেঘমালা হাস্যোৎফুল্ল মুখে একবার ফাল্গুনী ও ঠাকুরমার মুখের দিকে চেয়ে লজ্জায় মুখ নত করল। ফাল্গুনী সেই ব্রীড়াময়ীর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ঠাকুরমা তাদের ভাববিহ্বল ভাব দেখে সুখী হয়ে বললেন—তোমরা পরস্পরকে এখন যাচাই ক'রে নাও, আমি তোমাদের খাবার দেবার ব্যবস্থা করি গে।

ঠাকুরমা বেরিয়ে চ'লে গেলেন। ফাল্গুনী ও মেঘমালা সুখাবেশে আবিষ্ট হয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় রুস্তমজী ফাল্গুনী ও মেঘমালার পা পরিবেষ্টন করতে করতে ডাকলে—ম্যাওঁও!

মেঘমালার সরমশিথিল হাত থেকে ফাল্গুনীর হাত খ'সে পড়ছিল। সে সুখস্বর্গ থেকে স্খলিত হাত দিয়ে রুস্তমজীকে কোলে তুলে নিয়ে

হাসিমুখে মেঘমালার দিকে ফিরিয়ে বল্‌লে—আমাদের ঘটক ঠাকুর! একে ঘটক-বিদায় খুব ভালো রকম কিছু দিতে হবে।

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—ঘটক-বিদায় তো আগেই পেয়ে গেছে,—রূপোর হার।

ফাল্গুনী একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—কিন্তু যিনি রূপের হার, তাঁকে ঠাকুরমা যে তুচ্ছ উপহার দিয়ে গেলেন, সেটা কি তাঁর গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হলো?

মেঘমালা একটু হেসে লজ্জাজড়িত স্বরে বল্‌লে,—গ্রহণযোগ্য যদি না হতো, তা হ'লে কি অ-নিরুদ্ধ হয়ে উষার মন্দির পর্যন্ত পৌছাতে পার্‌তেন?

ফাল্গুনীর গম্ভীর মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রফুল্ল হলো না। সে গম্ভীরভাবেই বল্‌লে—কিন্তু আমার সম্পূর্ণ পরিচয় তো আপনি পান নি—

মেঘমালা একটু কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আপনি যেখানে যেখানে খোঁজ নিতে বলেছিলেন, সেখানে লোক পাঠিয়ে চিঠি লিখে টেলিগ্রাম ক'রে বাবা তো আপনার পরিচয় আনিয়েছেন—

ফাল্গুনী বল্‌লে—সে পরিচয় তো বাহিরের পরিচয়; আমি আপনাকে দু'একটা কথা বল্‌তে চাই—

মেঘমালাও ফাল্গুনীর গম্ভীর মুখ দেখে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল সে বল্‌লে—আপনি বসুন—

ফাল্গুনী বস্‌ল ; মেঘমালাও মাথা নত ক'রে বস্‌ল ; কিন্তু ফাল্গুনীর কথা শোন্‌বার জন্য তার মন উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

ফাল্গুনী বল্‌তে লাগ্‌ল—আজকাল আমাদের হতভাগা দেশের যে অবস্থা হয়েছে, তাতে দেশবাসী সকলকেই কিছু না কিছু দেশের কাজ করতে হবে। যখন ধনী বিলাসী জ্ঞানী গুনী মান্য ব্যক্তিরা দলে দলে জেলে চলেছেন, তখন সমর্থ কারও নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকা শুধু কাপুরুষতা নয়, অধর্ম।—

ফাল্গুনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘমালার মুখের দিকে চাইল। মেঘমালা মুখ তুল্‌লে না দেখে, মুহূর্তমাত্র থেমে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আমার দেশের স্বাধিকার দাবী করবার চেষ্টায় যে ব্রতী হবে, তাকে প্রাণপণ করেই লাগ্‌তে হবে—কত লোক তো প্রাণপাত করছে—

ফাল্গুনী আবার একটু থাম্‌ল। কিন্তু তখনও মেঘমালাকে নির্বাক দেখে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আমাদের বিবাহ-বন্ধন কি বন্ধন হবে?

এইবার মেঘমালা ক্ষীণস্বরে কথা বল্‌লে—আমি জানি, আপনি বীর ; আমি বীরপত্নী হবার চেষ্টা ক'রব—আমি আপনার সহধর্মিণী সহকর্মিণী হব।

ফাল্গুনীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল ; সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—আমার যদি কিছু হয়?—

ফাল্গুনীর প্রশ্নের মধ্যে তার প্রাণের আগ্রহ ফুটে উঠ্‌ল। সেই

আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে মেঘমালা ব'লে ফেললে—তোমার আরব্ধ কাজ আমি তুলে নেবো।

ফাল্গুনী মেঘমালার উদ্দীপ্ত মুখ থেকে দৃঢ় বাক্য শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু তার চিত্ত আনন্দে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল যে, সে আর কোনো কথাই বলতে পারল না, স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

দু'জনে নির্বাক্ নিস্পন্দ, অথচ সামনাসামনি ব'সে আছে; এক অপরের ভাবনায় তন্ময় হয়ে উঠেছে।

কতক্ষণ তারা এমনি ভাবেই ব'সেই ছিল, হঠাৎ ঠাকুরমার কথায় তাদের চমক হলো—

—বেশ লোকের কাছে তো অতিথিকে গচ্ছিত রেখে গেছি! দুজনে সেই থেকে চুপ মেরে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে আছ। যতই লেখাপড়া শেখো, ফুলশরের ঘা খেলে আর মুখে কথা সরে না! এসো, এখন খাবে এসো।

ফাল্গুনী ঠাকুরমার ঠাট্টা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল এবং মেঘমালা স্মিতমুখ নত ক'রে ব'সে রইল।

ফাল্গুনী তার ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে খেতে বসল। মেঘমালার মা পরিবেষণ করতে লাগ্‌লেন। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় উভয় পক্ষের অনেক পরিচয় আদান-প্রদান হলো এবং তাতে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হলো।

আঁচিয়ে ফিরে আসতে আসতে ফাল্গুনী ঠাকুরমার কাছে গিয়ে মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে বললে—ঠাকুরমা, আমার তো আর কেউ নেই, আপনাকেই

বরকর্তা হতে হবে। আপনি কন্যাকর্তাদের একটু জিজ্ঞাসা করুন, তাঁদের যদি পাত্র পছন্দ হয়ে থাকে, তবে আমি আজই পাকা দেখা ক'রে যেতে চাই।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে হেসে বললেন—দেখাটা পাকা-পাকি হ'তে কি এখনো বাকী আছে ভাই? আচ্ছা, আমি যখন আজ থেকে বরপক্ষ, তখন কন্যাপক্ষের সম্মতি নিয়ে আসি।

ঠাকুরমা ভৃত্যকে ফাল্গুনীর জন্য মশলা আন্‌তে ব'লে তাঁর পুত্র ও পুত্রবধুর নিকটে চ'লে গেলেন।

ভৃত্য একটি রূপার ডিবায় ক'রে মশলা এনে ফাল্গুনীর সাম্‌নে ধর্‌লে। ফাল্গুনী বিলম্ব কর্‌বার ইচ্ছাতেই ভৃত্যের হস্তধৃত ডিবার খোল থেকে বেছে বেছে একটু একটু ক'রে নানাবিধ মশলা তুলে নিতে লাগ্‌ল।

অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরমা হাসিমুখে ফিরে এসে বললেন—ঘটকী-বিদায় চাই ভাই, কন্যাপক্ষের হুকুম আদায় ক'রে এনেছি—চলো, পাকা দেখা কর্‌বে।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর হাত ধ'রে মেঘমালার ঘরের দিকে চলতে উদ্যত হলেন।

ফাল্গুনী বললে—দাঁড়ান ঠাকুরমা, ঘটকালির দক্ষিণাটা নগদ চুকিয়ে দি।

ঠাকুরমা কৌতূহলী হয়ে হাসিমুখে ফিরে দাঁড়ালেন।

ফাল্গুনী তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে।

ঠাকুরমা খুশী হয়ে ফাল্গুনীর চিবুক স্পর্শ ক'রে হাসিমুখে হস্ত চুম্বন ক'রে বল্‌লেন—এই বুঝি তোমার ঘটকালির পারিশ্রমিক!—দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য ভক্তিদান।

ঠাকুরমা হাস্‌তে হাস্‌তে ফাল্গুনীকে সঙ্গে নিয়ে মেঘমালার ঘরে গিয়ে বল্‌লেন—ওগো রূপসী সুন্দরী, তোমাকে দেখার সাধ এখনো তোমার উমেদারটির মেটে নি; তাই আবার এসেছেন পাকা দেখা করতে। তোমরা পরিণয়সূত্রটা পাকিয়ে শক্ত ক'রে দুজনকে বন্ধন করো। আশীর্বাদ করি, এই বন্ধন অক্ষয় হোক!

ঠাকুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

মেঘমালা দৃষ্টিতে কৌতূহল-ভরা প্রশ্ন নিয়ে ফাল্গুনীর দিকে চাইলে।

ফাল্গুনী বললে—আমি তোমার বাড়ীর সকলের অনুমতি নিয়ে এলাম; আজই আমি পাকা-দেখা ক'রে যেতে চাই; তুমিও অনুমতি দাও।

মেঘমালা চোখের দৃষ্টিতে লজ্জা আর আনন্দ এবং মুখের হাসিতে প্রণয়ের মধু মাখিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—দেখা পাকা হ'তে কি এখনো বাকী আছে? যে দিন তোমার কোলে আমার কুসুমঞ্জীকে দেখেছিলা., সেই দিনই তো পাকা-দেখা হয়ে গেছে।

ফাল্গুনী গায়ের খদ্দরের চাদর খুলতে খুলতে বললে—তুমি যে আমাকে গ্রহণ করেছ, তার কিছু চিহ্ন আমি তোমার কাছে রেখে যেতে চাই।

মেঘমালা অবাক্ হয়ে দেখ্‌তে লাগল, ফাল্গুনীর গলায় পৈতার মতন

ক'রে একটা খদ্দরের থলী ঝুলানো আছে, তা থেকে সে বাহির করতে লাগ্‌ল একখানা খদ্দরের শাড়ী আর ব্লাউস, একটা গহনার কেস, একটা সুন্দর খাপে ভরা সুন্দর বাঁট দেওয়া ছোরা, আর তিনটি সোনার কৌটা।

ফাল্গুনী সামগ্রীগুলি একটি টেবিলের উপর রেখে একে একে তুলে তুলে মেঘমালার হাতে দিতে লাগ্‌ল ও বল্‌তে লাগ্‌ল—আমার নিজের হাতের চরকা-কাটা সূতো দিয়ে নিজের তাঁতে বোনা এই শাড়ী আর ব্লাউস; এই কৌটাটিতে আছে সবরমতীর মাটি; এই কৌটাটীতে আছে যারবাদা জেলের দরজার মাটি; এই কৌটাটিতে আছে গান্ধীজীর হাতে তৈরী সূতা; আর এইটি আমার সঙ্গী, আজ থেকে তোমার সঙ্গী হয়ে থাক্‌বে। স্বাবলম্বন, স্বদেশের দুঃখবোধ আর দুঃখ দূর করবার জন্য দুঃখবরণ, ন্যায্য অধিকার জোর ক'রে দাবী করবার সাহস ও শক্তি, আর আর্তত্রাণ ও আত্মরক্ষার প্রতীক হলো এই জিনিসগুলি;—এগুলি তুমি গ্রহণ করো—

ফাল্গুনী সেইগুলি তুলে মেঘমালার হাতে দিতে উদ্যত হলো। মেঘমালা তাড়াতাড়ি পায়ের চটি-জুতা খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল এবং ফাল্গুনীর সাম্‌নে দুই হাত যুক্ত ক'রে অঞ্জলি পেতে দিলে। পবিত্র দেবনির্মাল্য গ্রহণ করবার সময় ভক্তের মুখ যেমন হয়, মেঘমালার মুখে তেমনি একটি পবিত্র শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-ভক্তির ভাব ফুটে ওঠাতে তাকে শুদ্ধাচারিণী পূজারিণীর মত দেখ্‌তে হলো।

ফাল্গুনী সামগ্রীগুলি মেঘমালার হাতের উপর তুলে দিলে। তার পর

গহনার কেসটি খুলে একজোড়া সুন্দর জড়োয়া ব্রেস্‌লেট বাহির ক'রে বল্‌লে—আর এইটি আমাদের উভয়ের প্রণয়ের রাখীবন্ধন। এসো, তোমার হাতে পরিয়ে দিয়ে যাই।

মেঘমালা জিনিস-ভরা দুই হাত মাথায় ঠেকিয়ে জিনিসগুলি টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখ্‌লে ; আর তার পরে দুই হাত ফাল্গুনীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মধুর ক'রে হাসলে।

ফাল্গুনী মেঘমালার দুই হাতে ব্রেসলেট পরিয়ে দিয়ে বললে—তোমার কিছু চিহ্ন আমাকে দাও।

ফাল্গুনীর এই প্রার্থনায় মেঘমালা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, তার কি আছে—যা সে ফাল্গুনীকে উপহার দিতে পারে। সে বিব্রত ব্যাকুল হয়ে ফাল্গুনীর দিকে চোখ তুলে চাইতেই দেখলে, ঘরের এক কোণে একটা তেকোণা তেপায়ার উপর ফ্রেমে তারই একখানা ফটোগ্রাফের দিকে ফাল্গুনী তাকিয়ে আছে। অমনি মেঘমালা সেই ছবিটা তুলে এনে ফাল্গুনীর হাতে দিল। ফাল্গুনী খুশীর হাসিতে মুখ উল্লাসিত ক'রে বললে—আজ নকল নিয়ে চললাম। শীগ্‌গির এসে আসলটিকে নিয়ে যাব। আজ তবে আসি—

ফাল্গুনী ফটোগ্রাফটি গলার থলীর মধ্যে রেখে বেরিয়ে চলেছে। কুস্তমজী এসে তার পা ঘিরে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লে ম্যাওঁ!

ফাল্গুনী হেসে নত হয়ে তাকে দেখে বল্‌লে—ঘটকের কথা তো ভুলেই

গিয়েছিলাম সিদ্ধির নেশায়! ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি? তোকে কিন্তু একেবারে ভুলি নি।

এই ব'লে ফাল্গুনী তার থলী থেকে একটা নীল কাগজের পুরিয়া বাহির করলে এবং তা থেকে সোনার হারে গাঁথা সোনার ঘুঙুরগুচ্ছ বাহির ক'রে রুস্তমজীর গলায় পরিয়ে দিলে। তার পর হাসিমুখে মেঘমালার দিকে একবার তাকিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখে ঠাকুরমা বল্‌লেন—কি ভাই, দেখা পাকল? দেখা থেকে যে মধুর রস ঝ'রে পড়্‌ছে দেখ্‌ছি!

সেখানে মেঘমালার পিতামাতাও ছিলেন। তাই ফাল্গুনী হাসিমুখ নত ক'রে নীরবে দাঁড়াল।

মেঘমালার পিতা বল্‌লেন—এস বস্‌বে এস।

ফাল্গুনী বল্‌লে—আর বস্‌ব না, এখন আমি যাই—

ঠাকুরমা বল্‌লেন—আর বস্‌বে কেন?

বামুন বাদল বান
দক্ষিণা পেলেই যান।

কিন্তু কাল থেকে রোজ আস্‌তে হবে—পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ নিয়ে দূরে থাক্‌লে আর ছাড়্‌ব না।

ফাল্গুনী হাসতে হাসতে চ'লে গেল।

ঠাকুরমা মেঘমালার ঘরে যেতে যেতে ডাক্‌লেন—কি লো, পাকা দেখা খেয়েই থাক্‌তে হবে, না আর কিছু খেতে হবে?

ঠাকুরমা গিয়ে দেখ্‌লেন, ছোট্ট একটি টেবিলের উপর ফাল্গুনীর উপহারের দ্রব্যগুলি সাজিয়ে রেখে তার সাম্‌নে মেঘমালা স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে।

মেঘমালা তখন ভাব্‌ছিল—তাদের এই বিবাহ তো শুধু আনন্দবিলাস নয়, এ যে দুষ্কর ব্রতে দীক্ষা!

*　　*　　*　　*　　*

আজ মেঘমালার বিয়ের দিন। ভোর থেকে বর আর কনের বাড়ীতে নহবত বাজ্‌ছে। দুই বাড়ীই পুষ্পপল্লব, পতাকা ও আলোকে সুসজ্জিত হয়েছে। মেঘমালার মন আনন্দ ও আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে রয়েছে।

রাত্রি দশটার পর লগ্ন।

সন্ধ্যার পর থেকে বরের বাড়ীতে খুব ঘন ঘন মোটরগাড়ী আনাগোনা করতে লাগ্‌ল। একটা মোটর-লরীতে ক'রে বাড়ী থেকে বহু আসবাব-পত্র কোথায় রওনা হয়ে গেল।

লগ্ন উপস্থিত। বর তো এখনো এলো না।

কন্যার বাড়ী থেকে লোক গেল বরকে ত্বরা দিয়ে আন্‌তে।

সেই লোক ফিরে এসে সংবাদ দিলে, বরের বাড়ীতে জনমানব নেই, কোনো জিনিসপত্র নেই, শূন্য ঘরে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলোক জ্বলছে, আর

বাড়ীর বাইরে পুষ্পপল্লব-শোভিত আলোকমালায় ভূষিত টঙের উপর ব'সে নহবতওয়ালারা সাহানা রাগিণী আলাপ করছে।

এ কী অভাবনীয় ব্যাপার !

মেঘমালার পিতা দূতের সংবাদ বিশ্বাস করতে পারলেন না ; নিজে ছুটে গেলেন নিজের চোখে দেখতে। কেউ কোথাও নেই—ফাল্গুনী নেই, তার বৃদ্ধ ভৃত্য রাইচরণ নেই, তার পাচক যোগেশ ঠাকুর নেই, দ্বারবান শিউধর নেই।

নহবতওয়ালাদের জিজ্ঞাসা ও জেরা ক'রেও কিছু জানা গেল না ; তারা টঙের উপর ব'সে ব'সে দেখেছে, মোটরে ক'রে বিবাহ-বাড়ীতে অনেক বাবু আসা-যাওয়া করেছে, লরীতে ক'রে অনেক মালপত্র কোথায় রওনা হয়ে গেছে। বাজনাওয়ালার পারিশ্রমিক ও বক্‌শিশ সন্ধ্যাবেলাই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলো কণ্ট্রাক্‌টারকেও তার পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লোক ছুটল বাড়ীওয়ালার কাছে, তিনি যদি তাঁর ভাড়াটের কোনো খোঁজখবর দিতে পারেন।

বাড়ীওয়ালা বললে—ফাল্গুনী-বাবু মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাড়ীভাড়া আগাম চুকিয়ে দেন ; তাঁর কাছে কিছু পাওনা নেই। তিনি কোথায় গেছেন, আমরা তো জানি না। বাড়ীতে যদি কেউ না থাকে, তা হ'লে আজকে রাতে পাহারা দেবার জন্যে আমরা একজন দারোয়ান পাঠিয়ে দিচ্ছি ; কাল সকালে সে বাড়ীতে তালা দিয়ে চ'লে আসবে।

মেঘমালার পিতা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌লেন। বাড়ীতে নিরানন্দ গুমোট হয়ে উঠ্‌লো। কেউ হাসে না, চেঁচিয়ে কথা বলে না। নহবত থেমে গেল; বাড়ীর বাহিরের আলোকমালা নিবিয়ে দেওয়া হলো। কন্যাযাত্রীরা সব চুপচাপ ক'রে একে একে খেয়ে নিয়ে স'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল; অনেকে না খেয়েই চ'লে গেল।

মেঘমালা টুক্‌রা-টাক্‌রো কানাঘুষা কথা শুনে ব্যাপারটা জান্‌লে। সে স্তম্ভিত হয়ে ব'সে ব'সে ভাব্‌ছিল—এ ফাল্গুনীর দ্বারা কেমন ক'রে সম্ভব হলো। অমন স্পষ্ট খোলাখুলি যার বাক্য ও ব্যবহার, তার এই গোপন রহস্যময় অন্তর্ধানের অর্থ কি!

রাত্রি যখন একটা, ফাল্গুনীর ফিরে আসার আশা যখন একেবারে ছেড়ে দিতেই হলো, তখন মেঘমালার ঠাকুরমা অবারণ চোখের জল গোপন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে করতে এসে মেঘমালাকে বল্‌লে—ভাই মালা, একটু কিছু খেয়ে শুবি চল।

মেঘমালা স্থির কণ্ঠেই বল্‌লে—আজ আর কিছু খাব না ঠাকুরমা। তুমি যাও, আমি গয়না-কাপড় ছেড়ে শুচ্ছি।

ঠাকুরমা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বেরিয়ে গেলেন। তিনি যেতে যেতে ভাব্‌লেন—হায় রে হতভাগী, এখনো আশা—যদি সে ফিরে আসে উপোষ ক'রে সারা রাত সেই লক্ষ্মীছাড়াটার জন্যে প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে!

মেঘমালার মা ও বাবা তো মেঘমালার কাছেই আস্‌তে পার্‌লেন না,

মেয়ের মলিন মুখ তাঁরা কেমন ক'রে দেখ্‌বেন, মেয়ের কাছে তাঁরাই বা কেমন ক'রে মুখ দেখাবেন ?

ভোরবেলা ঠাকুরমা ধীরে ধীরে মেঘমালার ঘরের দিকে চল্‌লেন—উপোষী মেয়েটার যদি ঘুম ভেঙে থাকে তো সকাল-সকাল তাকে স্নান করিয়ে কিছু খাওয়াতে হবে।

ঠাকুরমা আস্তে দরজা ঠেলে উঁকি মেরে দেখ্‌লেন—মেঘমালা সেই সাজ প'ড়েই তখনো ব'সে আছে।

ঠাকুরমা ঘরের মধ্যে গিয়ে মেঘমালার মাথায় হাত রেখে স্নেহার্দ্র স্বরে বল্‌লেন—এবার ওঠ ভাই, চল, চান ক'রে একটু কিছু মুখে দিবি।

মেঘমালা নীরবে উঠে দাঁড়াল এবং এক এক করে গয়নাগুলি খুলে খুলে বাক্সের মধ্যে তুলে রাখ্‌তে লাগ্‌ল।

তার পিছনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরমা ক্রমাগত চোখ মুছেও অশ্রুস্রোত রোধ করতে পারছিলেন না। আর মেঘমালার মনের মধ্যে কান্নার সুরে গুঞ্জন করছিল গানের একটি কলি—

"এত প্রেম-আশা এত ভালোবাসা
কেমনে সে গেল পাসরি'।"

স্নান ক'রে মেঘমালা যখন খেতে বসল তখন সে জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুরমা রুস্তমজী কৈ ?

—তাই তো, কাল থেকে তো তার কথা কেউ ভাবে নি। কোথায় সে ? তাকে কাল রাত্তে দেখা গেছে, এমনও তো মনে হয় না।

রুস্তমজীকে কাছে পেলে মেঘমালার মনটা একটু প্রফুল্ল অন্যমনস্ক

হবে মনে ক'রে আজ ঠাকুরমাও রুস্তমজীর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। চাকরদাসীদের বল্‌লেন, দেখ তো রুসো কোথায় আছে।

সমস্ত বাড়ী খুঁজে রুস্তমজীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

মেঘমালা এই সংবাদ শুনে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপ্‌লে। কোলের ছেলে হারিয়ে যাওয়ার শূন্যতায় তার মনটা খাঁ-খাঁ করতে লাগ্‌ল, কিন্তু মুখে একটি কথাও উচ্চারণ কর্‌লে না। তার মনে হলো, ফাল্গুনীর রহস্যময় অন্তর্ধানের সঙ্গে রুস্তমজীও অন্তর্ধান জড়িত আছে—হয় তো ফাল্গুনীই তাকে নিয়ে গেছে। কেন? মেঘমালার আদরের বিড়াল ব'লে কি তাকে কাছে রাখ্‌বার জন্যে ফাল্গুনী তাকে নিয়ে গেছে? কিন্তু মেঘমালার তো সবই গেল।

* * * * *

দু'দিন কেটে গেছে। ফাল্গুনী বা রুস্তমজীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। মেঘমালার পিতা খবরের কাগজে রুস্তমজীকে খুঁজে দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার স্বীকার ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। যে বিড়াল তাঁদের চক্ষুঃশূল ছিল, সে এখন ফিরে এলে তাঁরা তাকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

তার পরদিন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবরে সমস্ত দেশ উচ্চকিত আশ্চর্য্য হয়ে উঠ্‌ল। লোকে ভুলে গেল নিজেদের সুখ-দুঃখ, সকলে কয়েকজন মরণব্রতী যুবকের দুঃসাহসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো।

তারও দুদিন পরে মেঘমালার পিতা একখানা চিঠি পেলেন—চট্টগ্রাম থেকে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁর বিজ্ঞাপন দেখে

জানিয়েছে—আপনার বিজ্ঞাপনের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে, এমন একটি বিড়াল আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে ; তার গলার রূপার মাদুলীর মধ্যে একফালি কাগজে লালকালী দিয়ে লেখা আছে—

বন্দে মাতরম্ !

এই বিড়ালটি নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে কেউ চুরি ক'রে চট্টগ্রামে নিয়ে এসেছিল। এখন সে পালিয়ে আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। আপনারা তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

মেঘমালার পিতা মেঘমালাকে সুসংবাদ দেবার জন্য তার ঘরে এসে দেখ্‌লেন, সে যে কাঁচের আলমারীতে ফাল্গুনীর দেওয়া জিনিসগুলি সাজিয়ে রেখেছে, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কন্যার হাতে চট্টগ্রামের চিঠিখানি দিয়ে বললেন—ফাল্গুনী যে এমন ডাকাত, তা তো জান্‌তাম না ! ভাগ্যিস তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যায় নি ! ভগবান বাঁচিয়েছেন !

মেঘমালা পত্রখানি প'ড়ে নীরবে বাবার হাতে ফিরিয়ে দিলে। তিনি চ'লে গেলেন।

মা ও স্ত্রীর কাছে গিয়ে তিনি চট্টগ্রামের ব্যাপারই আলোচনা করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা অবাক হয়ে দেখ্‌লেন, মেঘমালা সেখানেই আসছে, তার পরনে ফাল্গুনীর দেওয়া খদ্দরের জামা-কাপড় আর হাতে একটি ছোট পুঁটলি, সে ধীরে ধীরে তাঁদের কাছে এসে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললে—আমি সবরমতী যাচ্ছি !

হবে মনে ক'রে আজ ঠাকুরমাও রুস্তমজীর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। চাকরদাসীদের বল্‌লেন. দেখ তো রুসো কোথায় আছে।

সমস্ত বাড়ী খুঁজে রুস্তমজীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

মেঘমালা এই সংবাদ শুনে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপ্‌লে। কোলের ছেলে হারিয়ে যাওয়ার শূন্যতায় তার মনটা খাঁ-খাঁ করতে লাগ্‌ল, কিন্তু মুখে একটি কথাও উচ্চারণ করলে না। তার মনে হলো, ফাল্গুনীর রহস্যময় অন্তর্ধানের সঙ্গে রুস্তমজীও অন্তর্ধান জড়িত আছে—হয় তো ফাল্গুনীই তাকে নিয়ে গেছে। কেন? মেঘমালার আদরের বিড়াল ব'লে কি তাকে কাছে রাখ্‌বার জন্যে ফাল্গুনী তাকে নিয়ে গেছে? কিন্তু মেঘমালার তো সবই গেল।

* * * * *

দু'দিন কেটে গেছে। ফাল্গুনী বা রুস্তমজীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। মেঘমালার পিতা খবরের কাগজে রুস্তমজীকে খুঁজে দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার স্বীকার ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। যে বিড়াল তাঁদের চক্ষুঃশূল ছিল, সে এখন ফিরে এলে তাঁরা তাকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

তার পরদিন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবরে সমস্ত দেশ উচ্চকিত আশ্চর্য্য হয়ে উঠ্‌ল। লোকে ভুলে গেল নিজেদের সুখ-দুঃখ, সকলে কয়েকজন মরণব্রতী যুবকের দুঃসাহসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো।

তারও দুদিন পরে মেঘমালার পিতা একখানা চিঠি পেলেন—চট্টগ্রাম থেকে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁর বিজ্ঞাপন দেখে

জানিয়েছে—আপনার বিজ্ঞাপনের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে, এমন একটি বিড়াল আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে ; তার গলার রূপার মাদুলীর মধ্যে একফালি কাগজে লালকালী দিয়ে লেখা আছে—

বন্দে মাতরম্ !

এই বিড়ালটি নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে কেউ চুরি ক'রে চট্টগ্রামে নিয়ে এসেছিল। এখন সে পালিয়ে আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। আপনারা তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

মেঘমালার পিতা মেঘমালাকে সুসংবাদ দেবার জন্য তার ঘরে এসে দেখ্‌লেন, সে যে কাঁচের আলমারীতে ফাল্গুনীর দেওয়া জিনিসগুলি সাজিয়ে রেখেছে, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কন্যার হাতে চট্টগ্রামের চিঠিখানি দিয়ে বললেন—ফাল্গুনী যে এমন ডাকাত, তা তো জান্‌তাম না ! ভাগ্যিস তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যায় নি ! ভগবান বাঁচিয়েছেন !

মেঘমালা পত্রখানি প'ড়ে নীরবে বাবার হাতে ফিরিয়ে দিলে। তিনি চ'লে গেলেন।

মা ও স্ত্রীর কাছে গিয়ে তিনি চট্টগ্রামের ব্যাপারই আলোচনা করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা অবাক হয়ে দেখ্‌লেন, মেঘমালা সেখানেই আসছে, তার পরনে ফাল্গুনীর দেওয়া খদ্দরের জামা-কাপড় আর হাতে একটি ছোট পুঁটলি, সে ধীরে ধীরে তাঁদের কাছে এসে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললে—আমি সবরমতী যাচ্ছি !

মনস্তাপ

কংগ্রেসের মেলা। এগ্‌জিবিশনে কত দেশের কত জিনিসের দোকান। দোকানে দোকানে সুন্দর দুর্লভ দ্রব্যের সজ্জা। দোকানের সাম্‌নে সাম্‌নে কত লোকের ভিড়—ক্রেতা অল্প, দর্শক অনেক। দু' সারি মনোহারী দোকানের মাঝখান দিয়ে লাল-সুরকীর পথ, যেন সুন্দরীর সীঁথিতে সিঁদূর ঢালা। সেই পথ দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া কচুরী-পানার ঝাঁকের মতন, আর নদীর এপারে ওপারে বাঁকে বাঁওড়ে সেই পানা আট্‌কে যাওয়ার মতন লোকেরা এ-দোকানে সে-দোকানে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে। দোকানের সাম্‌নে দাঁড়ানো দর্শকদের মধ্যে দু-এক জন রমনী থাক্‌লে সেখানে ভীর একটু ঘন হচ্ছে; সেই রমণীরা সুন্দরী না হ'লে ও দোকানের দ্রব্যসম্ভার নয়ন-রঞ্জক না হ'লে ভিড় আবার পাত্‌লা হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে—জনস্রোত জলস্রোতের মতন এগিয়ে চলেছে। যে দোকানে দ্রব্য সুন্দর, সেখানে এমনই লোকের ভিড় জম্‌ছে; তার মধ্যে সুন্দরীর সমাগম হ'লে তো ব্যূহ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠ্‌ছে। ধনের ঘরে রূপের বাসা! কত ধনিগৃহের অন্তঃপুরিকা অবরোধ ছেড়ে অবগুণ্ঠন খাটো ক'রে মেলায় এসেছে। রূপের আগুন লেগেছে! তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটেছে কত রূপোপ-জীবিনী, তাদের রূপের চটক প্রচার ক'রে রূপের নেশায় পুরুষভ্রমরদের

বশ কর্‌তে। রূপের জেল্লায় তাদের কেউ কেউ গৃহস্থঘরের বৌঝিদের পরাস্ত করেছে ; কিন্তু কুলবধূদের শ্রীমণ্ডিত স্নিগ্ধ শ্রীর কাছে তাদের শালীনতাশূন্য উগ্রতা নিতান্ত হীন প্রতিপন্ন হয়ে যাচ্ছে ; দর্শকদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরেই যেন ধিক্কার দিয়ে জানিয়ে যাচ্ছে, সৌন্দর্যের চেয়ে মাধুর্য অধিকতর মনোরম। এই রকমে কেবল লোকের ভিড় দেখ্‌তেই লোকের ভিড় দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এক দিন সকাল-বেলা খবরের কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো—

স্বয়ম্বর ! **স্বয়ম্বর !**

কলিকালে অভাবনীয় ব্যাপার !

এক জন অশেষ-ঐশ্বর্যশালিনী অপূর্ব রূপসী যুবতী

স্বয়ং স্বামী নির্বাচন করিবেন !

কংগ্রেসের মেলায়

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত স্বর্ণাকারের দোকানে

সেই মহিলা

তাঁহার শুভবিবাহের

অলঙ্কার

নির্বাচন করিবার জন্য অদ্য হইতে সাত দিন ক্রমান্বয়ে

সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টার মধ্যে

কোনও সময়ে আসিবেন

এবং সেইখানে সমবেত পুরুষদের মধ্য হইতে

তাঁহার পছন্দসই বরও নির্বাচন করিবেন।

স্বয়ম্বরা সুন্দরী জাতিভেদ মানেন না,

তাঁহার ধনী নির্ধন বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই,

যাহাকে চোখে ধরিবে, তাহাকেই বরণ করিবেন।

অতএব আসুন যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ

আর আসুন

নূতন দৃশ্য দেখিতে আবালবৃদ্ধবনিতা!

এই বিজ্ঞাপন নিয়ে শহরে শহরে হুলস্থুল প'ড়ে গেল। কেউ বল্‌লে—এটা ঐ সেক্‌রার দোকানে লোক ডাক্‌বার ফিকির। কেউ বল্‌লে—হোক ফিকির; তবু এই হিড়িকে ঐ দোকানে লোক জম্‌বে দেদার, তার মধ্যে রোমান্স ঘটা আশ্চর্য কি! কেউ কেউ বল্‌লে—বিজ্ঞাপনটা সত্যিও তো হ'তে পারে? আজকালকার কালে সুন্দরীর স্বয়ম্বরা হওয়াটা খুবই সম্ভব।

শেষের মত যাদের, তাদের মধ্যে বরিশালের নবীন উকীল বিমল পাকড়াশী একজন। সে সেই দিনই সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে বাক্‌স-বিছানা নিয়ে কল্‌কাতা রওনা হলো। সে মনে মনে এক-রকম স্থির ক'রেই ফেল্‌লে যে, তার 'নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ' যখন আছে, আর তার পদবীটাও পাকড়াশী, তখন সেই স্বয়ম্বরা সুন্দরীর হৃদয়

পাকড়াও ক'রে একাতপত্রং রমণী-প্রভুত্বং লাভ করবে। বিমল উৎফুল্ল মুখে আশাভরা মন নিয়ে কলকাতায় এক হোটেলে গিয়ে উঠল—কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ীতে গেল না, চেনা লোকের সামনে ইচ্ছা-মতো প্রসাধন ও বেশভূষা ধারণ করতে সঙ্কোচ হবার আশঙ্কা তো আছে!

বিমল কলকাতায় পৌঁছে হোটেলে জিনিষপত্র রেখেই বাজারে বেরিয়ে পড়ল। সে চওড়া জড়িপাড় শান্তিপুরে ধুতি, সিল্কের গেঞ্জী আর মোজা, তসরের সার্ট, নেভী-ব্লু রঙের সার্জের ওপ্‌ন্‌-ব্রেষ্ট কোর্ট, কমলা-রঙের জড়ির উপর নীল পাড় দেওয়া জার্মাণ শাল, আর পেটেন্ট্‌ লেদারের পাম্প্‌-শু কিনে বাবু-সজ্জা সংগ্রহ করলে। বাসায় ফিরে তার মনে পড়ল, রঙীন ফুলকাটা রুমাল আর একটা সৌখীন ফ্যান্সী ছড়ি কিনতে ভুল হয়ে গেছে। সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে ছড়ি আর রুমাল কিনতে আবার বাজারে দৌড়াল। পথে মনে পড়ল, এসেন্স্‌ আর ওটিন স্নোর কথা।

বিমল বাসায় ফিরেই তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিলে। তার পর ঘরে দরজা দিয়ে প্রসাধন আর বেশভূষা করতে লেগে গেল।

ঝাড়া দু ঘণ্টা আয়নার সামনে বিচিত্র মুখভঙ্গী ক'রে সে সজ্জা শেষ করলে, আর তার পর আয়না মুখের এপাশে ওপাশে উপরে নীচে পিছনে সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ ক'রে দেখে নিলে, কোথাও কিছু খুঁৎ আছে কি না; তার পর দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে প্রফুল্ল মুখে সন্তুষ্ট মনে সে দরজা খুলে বেরুল। নীচে নেমেই হোটেলের

ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ; এখানে এই লোকটির সঙ্গেই বিমলের কিঞ্চিৎ আলাপ-পরিচয় হয়েছে হোটেলে ভর্তি হওয়া উপলক্ষ্যে : তাই সে এই স্বল্পপরিচিত লোকটির সাম্‌নে এসে প'ড়েই কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়্‌ল এবং লজ্জিতভাবে "একবার এক্‌জিবিশনটা দেখে আসি" বলেই ক্ষিপ্র পদে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল। ম্যানেজার একটু মুচ্‌কি হাস্‌লে।

বিমল কিন্তু সোজা মেলায় গেল না। সে গেল লরেন্স মেয়োর চশ্‌মার দোকানে···তার চাই একটা রীমলেস্ প্যাঁস্-নে চশ্‌মা! সে দোকানদার ইংরেজের কাছে সটান মিথ্যা কথা বল্‌লে—"সে আজ রাত্রেই দেশে চ'লে যেতে চায়, এখনই তার চশ্‌মা পেলে ভাল হয়।" দোকানী বল্‌লে—"চশমা রীম-লেস্ হ'লেও নাক-চিম্‌টা স্প্রিংটা ফিট ক'রে দিতে তো একটু সময় লাগবে—চশ্‌মা কাল বিকালের আগে কিছুতেই রেডী হ'তে পারে না।" বিমল কাতর হয়ে মিনতির স্বরে বল্‌লে—"দাম বেশী দেবো যদি আজই ৬টার আগে দিতে পারেন।" দোকানী ইংরেজ গম্ভীরভাবে বল্‌লে—"আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ছি—কিন্তু এর জন্যে আঁপনাকে বেশী দাম দিতে হবে না।" বিমল ধন্যবাদ জানিয়ে আবার চশ্‌মাটা আজই দেবার অনুরোধ ক'রে দোকান থেকে বেরুল।

বিমল চশ্‌মার দোকান থেকে গেল ইংরেজ হেয়ার কাটারের দোকানে। সেখানে চৌদ্দ আনা-দু আনা চুল কাটিয়ে দাড়ি কামিয়ে গোঁপে কস্‌মেটিক লাগিয়ে নবকার্ত্তিকটির বেশে বেরিয়ে এল।

ছটা বাজ্‌তে এখনও অনেক দেরী। এখন সে যায় কোথায়?

পথে পথে ঘুর্‌লে রোদে ধূলায় তার মুখশ্রী ম্লান হয়ে যাবার বিষম আশঙ্কা আছে। সে আস্তে আস্তে ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে গিয়ে ঢুক্‌ল পেলিটির দোকানে এবং এক কোণে ব'সে আইস্‌-ক্রীম আর ঠাণ্ডা পানীয় আন্‌তে ফর্‌মাস কর্‌লে। সে ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—সেই স্বয়ম্বরা সুন্দরীর কথা।—বিজ্ঞাপনে লিখেছে 'অপূর্ব রূপসী'! বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি খানিকটা বাদ দিলেও নিশ্চয় সে রূপবতী হবেই। যুবতী, রূপসী, ঐশ্বর্যশালিনী!—একবারে ত্র্যহস্পর্শ। যদি আমাকেই তার পছন্দ হয়! এই কথা যেই বিমলের মনে হওয়া আর অমনি এই লোভনীয় সম্ভাবনার অনির্বচনীয় আনন্দ তার মন ছাপিয়ে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়্‌ল, তার পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চ হতে লাগ্‌ল, সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

বিমল অস্থির হয়ে আইস-ক্রীম খাওয়া শেষ ক'রে হোটেল থেকে বেরুল এবং আবার সে চশ্‌মার দোকানে ফিরে এল। চশ্‌মা-ওয়ালা বিমলকে দেখেই দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানালে, আজ আর কিছুতেই চশ্‌মা তৈরি হয়ে উঠ্‌ল না; কাল বিকালে নিশ্চয়ই হবে। বিমল যদি কাল পর্যন্ত নিতান্তই থাক্‌তে না পারে, তবে ঠিকানা রেখে গেলে তারা তার চশ্‌মা ডাকে পাঠিয়ে দেবে, তার সমস্ত খরচ তারাই স্বীকার কর্‌বে, বিমলকে এর জন্য বেশী কিছু দিতে হবে না।

বিমল ক্ষুণ্ণ মনে ম্লান মুখে বল্‌লে—অগত্যা কালই সে নিজে এসে নিয়ে যাবে। কিন্তু কাল যেন সে নিশ্চয় চশমা পায়।

বিমল খুঁৎখুঁৎ মন নিয়ে মেলায় গেল। তখন ছটা বেজে গেছে;

দোকানে দোকানে বিবিধ বর্ণের আলো জ্বলছে। সে প্রত্যেক দোকানের উপর কেবলমাত্র চোখ বোলাতে বোলাতে দ্রুতপদে লক্ষ্মীকান্ত স্বর্ণাকারের দোকান কোন্ দিকে, তারই সন্ধান ক'রে চলতে লাগল। যতই দেরী হয়ে যাচ্ছে, ততই তার আশঙ্কা বেড়ে উঠ্ছে যে, হয় তো এতক্ষণে সুন্দরী আর কাউকে পছন্দ ক'রে ফেললে বা! তাকে একবার দেখ্‌লে যে সুন্দরীর চোখে আর মনে আর কাউকে ধর্‌বে না, সে-সম্বন্ধে একটা অস্বীকৃত আশা ও বিশ্বাস বিমলের মনের তলায় ছিল ব'লেই সকলের আগে সুন্দরীর দৃষ্টিগোচর হবার তার এত আগ্রহ।

বিমল খানিকক্ষণ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সেই সেক্‌রার দোকান দেখ্‌তে পেলে। তখন সেখানে একটু ভিড়ও জমেছে। বিমলের বুকের মধ্যে রক্তধারা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, মুখ উজ্জ্বল ও চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌ল— তা হ'লে রূপসী দোকানে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়্‌ল, তার চশ্‌মা সে আজ পায় নি, কিসের শোভায় সে কিশোরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে? ময়ূরের যেমন পুচ্ছ, কোকিলের স্বর, সিংহের কেশর, তাদের প্রেয়সীদের মন ভোলাবার আয়োজন, তেমন সঙ্গতি বিমলের কি আছে? তার সহজ শ্রী আছে ব'লে তার আয়না রোজ তার কাছে সাক্ষ্য দেয় বটে; কিন্তু সেই আয়নার প্রতিচ্ছায়া সে দেখে তার নিজের চোখে, পরের চোখে সেটা কেমন লাগে, তা কে জানে? তার পাড়ার বিধবা সৌদামিনী এক দিন তাকে দেখে মুচকি হেসে গা দুলিয়ে চ'লে গিয়েছিল বটে, আর তার মুরুব্বি সিনিয়র উকীল ক্ষিতীশ-বাবুর বালিকা

পুত্র-বধূ এক দিন পাশের ঘরের জান্‌লা থেকে তাকে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিল বটে, কিন্তু তাতে তো প্রমান হয় না যে, স্বয়ম্বরা সুন্দরী সকলকে ছেড়ে তাকেই পছন্দ ক'রে বরণ করবে! সজ্জা যথোচিত জম্‌কালো হয়েছে বটে—গা তো নয়, যেন সাপোলিন রঙের দোকানে নমুনার বিজ্ঞাপন—হরেক রকম রঙের পাটী-আঁকা পাটা! এর উপর চোখে ষ্টাইলিশ রীম-লেস প্যাঁস্-নে চশ্‌মাটা থাক্‌লে ক্যা খাপসুরৎ হ'ত—সুন্দরীর নজর অমনি খপ্‌ ক'রে রূপের খপ্পরে পড়্‌ত!

বিমল সত্বর এগিয়ে গিয়ে দোকানের সাম্‌নে ভিড়ের পিছনে দাঁড়াল এবং ব্যগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল সেই স্বয়ম্বরা সুন্দরী কোথায় বিরাজ করছে।

দোকানে কোনো সুন্দরী নেই।

তবে কি ভিড়ের ভিতর মিশে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বাছাই হচ্ছে?

বিমল তীক্ষ্ণ উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেখানে সমাগত সকল স্ত্রীলোকের মুখ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বুড়ী—কালো মোটা—ময়লা ছেঁড়া আলোয়ানের ঘোমটা-টানা মেয়েগুলোর দিকে দৃষ্টি হেনেই বিমল চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছে—এ নয়, এ নয়, এও নয়। তবে কে? আহা মরি রূপসী তো এখানে এক জনও নেই? তবে কি ময়লা ছেঁড়া আলোয়ানের ঘোমটার আড়াল থেকে দৃষ্টি-সন্ধান চল্‌ছে? অলক্ষ্মীর ছদ্মবেশে কি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর গোপন অভিসার হয়েছে? বিমল বেহায়ার মতন কুলবধূর ঘোমটার ফাঁকে দৃষ্টি প্রেরণ করবার দুশ্চেষ্টা করতে

লাগ্‌ল এবং সেই ঘোমটার তলে তার কল্পিত সৌন্দর্যের আভাসটুকুও না পেয়ে তখনই সে হতাশ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে লাগ্‌ল! নেই—বিমলের কল্পনার ছবির মতন একটিও সুন্দরী নেই। তবে কি তিনি এখনও আসেন নি? স্বয়ম্বরের বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতায় এসে পৌছাতে তার দু'দিন দেরী হয়ে গেছে, তবে কি নির্বাচন আগেই হয়ে গেছে?

বিমল দুর্মনায়মান হয়ে স্বর্ণকারের দোকানের সাম্‌নে বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

আটটা বেজে গেল। কোনো বিশ্ববিলোচন-চোর সুন্দরীর শুভাগমন তো হ'ল না।

নটা বাজ্‌ল। তখন বিমল ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে লজ্জিত অপ্রতিভ মুখে স্বর্ণকারকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হ্যাঁ মশায়, বাছাই কি হয়ে গেছে?

দোকানী প্রশ্ন বুঝতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন কর্‌লে—কিসের বাছাই?

বিমল আম্‌তা-আম্‌তা কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—এই—সেই যে—স্বয়ম্বরের—

দোকানী হাসি চেপে বল্‌লে—ও! না।

—আজ কি তিনি আসেন নি?

—আমাদের কিছু বল্‌তে বারণ আছে।

বিমল বিমর্ষ হয়ে চ'লে যেতে যেতে ফিরে এসে আবার দোকানীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আচ্ছা মশায়, তিনি তো রোজ হাজার হাজার লোককে

দেখ্‌বেন, তার মধ্যে একজনকে ধরুন পছন্দ হ'ল আজ; কাল আবার তার চেয়ে পছন্দসই আর কাউকে মনে হ'তে পারে, নাও পারে; ধরুন, শেষ দিন পর্য্যন্ত দেখে দেখে তাঁর মনে হ'ল প্রথম দিনের ঐ লোকটিই সবচেয়ে ভালো; কিন্তু শেষের দিন সেই প্রথম লোকটি আর এল না; তখন তার সন্ধান তিনি পাবেন কি ক'রে?

দোকানী এবার আর হাসি চাপ্‌তে পার্‌লে না; তার হাসি দেখে বিমল অপ্রস্তুত হয়ে গেল। দোকানী হাসতে হাসতে বল্‌লে—যাঁকে যাঁকে তাঁর নজরে ধর্‌বে, তাঁকে তাঁকে একখানি ক'রে নিমন্ত্রণপত্র তখনই দেওয়া হবে—তাঁরা সেই রাজকুমারীর বাড়ীতে নির্দিষ্ট দিনে যাবেন আর তারপর সেই পছন্দসই পুরুষদের মধ্যে থেকে বেছে সবার সেরা পুরুষটিকে তিনি বরমাল্য দেবেন এবং উভয় পক্ষের সম্মতি স্থির হলে বিবাহ হবে; যদি কোনো কারণে দু'জনের মনের মিল না হয়, তা হ'লে পুনর্নির্বাচন হবে। এমনি ক'রে যখন চোখের দেখার সঙ্গে মনের প্রীতির মিল হবে, তখনই বিয়ে স্থির হবে।

বিমল চিন্তাকুল-চিত্তে স্বর্ণকারের দোকান ছেড়ে চল্‌ল। মেলার মধ্যে পথে পথে সে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু সে কিছুই লক্ষ্য কর্‌ছিল না, মনে কেবলই ভাব্‌ছিল সেই সুন্দরীর কথা; আর তার নিজের সফলতার সম্ভাবনার পরিমাণ।

বিমল একৃজিবিশনের কোনো দ্রষ্টব্যই মন দিয়ে দেখ্‌তে পারে না, তার মন প'ড়ে আছে সেই সেকরার দোকানে। সে সেকরার দোকান

ছেড়ে বেশী দূর অগ্রসর হ'তেও পারে না; অল্প দূর গিয়েই তার মনে হয়, এতক্ষণে তিনি এলেন বুঝি! হয় তো তাঁর দৃষ্টি বিমলের অবর্তমানে আর কোন্ হতভাগাকে সৌভাগ্যবান্ ক'রে ফেল্‌বে বা! বেচারা বিমল আবার ফিরে ফিরে আসে সেই সেকরার দোকানে।

এমনি ক'রে রাত দশটা পর্য্যন্ত সেকরার দোকানের কাছাকাছি ঘুরঘুর ক'রে শ্রান্ত-ক্লান্ত বিমল হোটেলে ফিরে এল!

রাত্রে স্বপ্ন দেখলে যে, স্বয়ম্বরা সুন্দরী তারই গলায় দেবে ব'লে বরমাল্য হাতে ক'রে তুলেছে, এমন সময় তাকে ঠেলে ফেলে সেইখানে এসে গলা বাড়িয়ে 'দাঁড়াল' বাচ্চা-ই-সাকো, আর তার গলার উদ্দেশে সুন্দরীর হস্তভ্রষ্ট বরণ-মালা গিয়ে পড়লো সেই জবরদস্ত ভিস্তির বাচ্চার গলায়! এই দুঃস্বপ্ন দেখে বিমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সারা রাত সে হোটেলের বারান্দায় ছটফট ক'রে পায়চারি ক'রে কাটালে।

সকাল তো হ'ল কিন্তু বিকাল তো হয় না। মডেল ভগিনীর কমলিনীর মতন বিমল ভাব্‌তে লাগ্‌ল—সূর্যের অধীন ঘড়ী না হয়ে ঘড়ীর অধীন সূর্য হ'ল না কেন? অনাগত ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক হয় তো সূর্যকে আজ্ঞাধীন করবে, কিন্তু তখন তো বিমল বিদ্যমান থাকবে না!

বিমল দুপুর বেলাটা ঘুমে নিমগ্ন থেকে একেবারে বিকালের কোলে জেগে উঠতে চাইলে। কিন্তু ঘুম কি আর আসে? অনেক কষ্টে ঘুম যদি বা এলো, তবে দশ পনেরো মিনিট পরে পরেই ছ্যাক-ছ্যাঁক করে ঘুম

ভেঙে যেতে লাগল—হয় তো বা সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে শুভ লগ্ন উত্তীর্ণ ক'রে ফেলেছে। সে শঙ্কিত ব্যগ্র দৃষ্টিতে হাতঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার চক্ষু মুদ্রিত করে।

অনেক কষ্টে তিনটা বাজ্‌ল। তখন সে উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে বেশবিন্যাসে নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে দিলে।

গতকল্যের মতন প্রসাধনপরিপাটী চেহারা নিয়ে সে গেল চশ্‌মার দোকানে। এক মুঠি টাকা গুণে দিয়ে চোখে পাউয়ারলেস্ চশ্‌মা চড়িয়ে খুশী-মনে হাসিমুখে বিমল রওনা হ'ল এগ্‌জিবিশনে।

আজও তার ভাগ্যে আহামরি গোছের অপরূপ সুন্দরীর সন্দর্শন ঘট্‌ল না।

এমনই রোজ দিন আসে, রাত যায়। বিমল বিফল হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

অবশেষে এক দিন বুঝি পরিহাস-রসিক প্রজাপতির প্রসন্ন দৃষ্টি বিমলের ভাগ্যের উপর পড়্‌ল !

বিমল মেলায় গিয়ে দেখ্‌লে, একটি অপরূপ রূপসী তন্বী ষোড়শী সেই স্বর্ণকারের দোকানের দিকে চলেছে। তাকে দেখেই বিমলের মন উল্লাসে ব'লে উঠ্‌ল—এই—এই—এ না হয়ে যায় না। এই তো পুরাণ-কল্পিতা তিলোত্তমা ! একেই মনে কল্পনা ক'রে মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন—সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ—বিধাতার আদি সৃষ্টি ; একেই বিধাতা

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা—ছবিতে মনের কল্পনা ফুটিয়ে তুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন !

বিমল সুন্দরীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি করবার জন্য ব্যাকুল ও ব্যগ্র হয়ে উঠল। কিন্তু তার মতন শত শত পুরুষ সেই রমণীয় রমণীর কান্তি একটুখানি দেখে নেবার আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে, বেচারা বিমল আর আগাতে পারে না। যতই তার সুন্দরীর নিকটে যেতে বিলম্ব হচ্ছে, ততই তার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠ্ছে—হায় হায়! হয় তো কোন্ হতভাগা সৌভাগ্য আগেই লুঠ ক'রে নিলে !

বিমল ভিড় ঠেলে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে গিয়ে সুন্দরীর দিকে চাইতেই তার বুক উঠল কেঁপে, মুখ শুকিয়ে—সুন্দরীর নজরে যদি সে না লাগে !

বিমল তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ফুলকাটা রেশমী রুমাল বা'র করে মুখ মুছলে—রুমালের এসেন্সের মৃদু সুরভিতে বাতাস ভুরভুরে হয়ে উঠ্‌ল—কুস্তুরীমৃগের গাত্রগন্ধ তার আকাঙ্ক্ষিতা প্রণয়িনীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিধাতার উপহার, আর বিমলের গাত্র-সৌরভ তার স্বোপার্জিত। ময়ূরপুচ্ছ বিস্তার করে তার রূপের চটকে ময়ূরীর মনোহরণ করতে, বিমল তার রঙীন রুমাল পকেট থেকে বাহির করে—রঙীন শাল গা থেকে খুলে আবার গায়ে দেয়—প্যাঁস-নে নাক থেকে নামিয়ে আবার তাকে লাগায় স্বয়ম্বরা সুন্দরীর নজরে পড়বার জন্য।

বিমলের মনে হ'ল সুন্দরী যেন তাকে দেখে মৃদু একটু গোলাপী হাসি হাসলে—যেমন হাসি হাসে নিশার কোলে সদ্যোজাগ্রতা কিশোরী

বন-জ্যোৎস্না

ঊষা, যেমন হাসি হাসে কোজাগরী পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ের পূর্বক্ষণে স্বচ্ছ সুনীল আকাশ !

সুন্দরীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা হ'ল বিমলের। তার মন করুণ স্বরে গেয়ে উঠ্‌ল—

"যহাঁ যহাঁ অরুণ-চরণ চলি যাত।
তহাঁ তহাঁ ধরণী হই এ মঝু গাত ?"

তরুণী রূপের তরণীর মতন মাধুর্যের হিল্লোল তুলে সেই বিজ্ঞাপন-দাতা জহুরী মণিকারের দোকানে গিয়ে প্রবেশ কর্‌ল। এমন কোন্ জহুরী মণিকার আছে যে, এই অমূল্য রত্নের নিরিখ ঠিক কর্‌তে পারে !

কিছুক্ষণ পরে বিমলের রূপদর্শনবিহ্বল চিন্তাশক্তি ফিরে এলো— হ্যাঁ, সুন্দরী বটে ! কি রূপ, কি সজ্জা, কি অলঙ্কার ! ঐশ্বর্যশালিনী মহারাণী বটে ! কাপড়ে জরির জলুস, অঙ্গে অঙ্গে জহরতের দীপ্তি ! ভূষণ তাকে ভূষিত করেছে, না ভূষণকে সে চরিতার্থতা দান করেছে, কে নির্ণয় কর্‌বে !

এই মহীয়সী মহিলার চরণতলে আপনাকে সমর্পণ ক'রে দেবার জন্যে বিমলের মন এমন ব্যাকুল হয়ে উঠল যে, সে নিজেকে আর সম্বরণ ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না। তীর্থে গিয়ে ভক্তের হৃদয় যখন ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে ওঠে, তখন সে আপনাকে দেবতার চরণে সমর্পণ কর্‌তে চায় এবং সেই বাসনা ব্যক্ত কর্‌বার চিহ্নস্বরূপ মহৎ ত্যাগের জন্য সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে—ভক্ত তখন একটা ফল, একটা প্রিয় খাদ্য, একটা

তাকালে ; তার পর বিমলের যুক্তকরের অঞ্জলিতে ক্রচটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ; তার পর তার মুখে হাসি ফুঠে উঠল, যেমন ফুলের হাসি ঝ'রে পড়ে উষার বাতাস লেগে শিউল-বকুল গাছ থেকে, আগুনের চুম্বন পেয়ে ফুলঝুরির মুখ থেকে। রূপসী খিলখিল ক'রে হেসে উঠে চারিদিকে চকিত দৃষ্টি হেনে কি যেন খুঁজতে লাগল।

বিমল তো একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল—সুন্দরী রাগ করেন নি, ভক্তের পূজার অর্ঘ্য হাসির ধারায় অভিষিক্ত ক'রে পবিত্র নির্মল ক'রে তুললেন। এই রমণীরা রমণী যেন সাক্ষাৎ প্রীতি-প্রতিমা,মূর্তিমতী করুণা, শরীরিণী সতীধর্ম্ম ! বিমলের মন সাফল্যের আশায় রঙীন হয়ে উঠল।

সুন্দরী তার আইভরির চুষিকাঠির মতন আঙুল দিয়ে যখন বিমলের হাত থেকে সেই উপহৃত ক্রচটি তুলে নিলে, তখন তো সে আর নেই ! সুন্দরীর আঙুলের স্পর্শ তার করতল থেকে বিষ- বিসর্পের মতন সকল দেহে মনে ইন্দ্রিয়ে চেতনায় ছড়িয়ে পড়ল—তার সমস্ত অস্তিত্ব তখন গ'লে গিয়ে একবিন্দু আনন্দরস হয়ে সুন্দরীর চরণকমলে গড়িয়ে পড়বার জন্যে টলটল করছে !

মনোহারিণী রমণী ক্রচটিকে ছ' আঙুলে উঁচু ক'রে ধ'রে মিহি মধুর টানা স্বরে বললে—এই শেঠজী, তোমার ভাণ্ডারে সিঁধ কাটা চলছে, তার খবর রাখো—

দোকানের অপর প্রান্তে একজন মোটা বেঁটে কদাকার মাড়োয়ারী অলঙ্কার দেখছিল ; সে সুন্দরীর কথা শুনে চমকে উঠে তার খাটো খাটো

দুই হাত দিয়ে তার ময়লা আধ পুরানো কোটের দুই পকেট চেপে ধ'রে গম্ভীর গলায় গর্জন ক'রে উঠ্‌ল—কৌন পাকিট্ কাট্‌তা হ্যায় রে!

সুন্দরীর শুক্তিপুটের মতন মুখ থেকে স্বরের ঝরণা-ধারার মতন হাসি ঝ'রে পড়্‌ল। সে কথায় গায়ে হাসি মাখিয়ে মাখিয়ে বল্‌লে—তোমার পকেট কেউ মারে নি শেঠজী, পকেটে কেউ নজর দেয় নি; তোমার ভাণ্ডারের সেরা জহর আমিই যে চুরি হয়ে যাচ্ছি!—এই বাবু আমাকে এই ব্রুচটি বায়না দিতে চাচ্ছেন, নেবো?

মাড়োয়ারীর কুৎসিত মুখখানা সেই মুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠ্‌ল, তার মুড়ো ঝাঁটার মতন গোঁপজোড়া ক্রুদ্ধ সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠ্‌ল; তার বিপুল স্ফীত ভুঁড়িটা বেলুনের মতন ফুলে উঠ্‌ল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বিমলের ভয়বিহ্বল অপ্রতিভ ভাব দেখে হেসে উঠ্‌ল—যেন কে একটা পিতলের ঘটীর মধ্যে মোটা কাঠ ঢুকিয়ে ঘন ঘন নাড়া দিয়ে আচ্ছা ক'রে বাজিয়ে দিলে; তার পর সে বল্‌লে—বাবুজী, ওৎনা থোড়া কিম্মৎ এই জহরকা ঠাহরা আপ! হামি ওনাকে পচাশ হাজার রূপেয়ার এক মোকান সেণ্ট্রাল এভেনিউর উপর কিনিয়ে দিয়েসে, পচাশ হাজার রূপেয়ার জেবর দিয়েসে, মাহিনামে হাজারো রূপেয়া দিয়ে ওনার মন পায় না। আপনি শক্‌বেন দিতে উসসে বেশী! আপনার ঐ ব্রুচটার কিম্মৎ কেতো?—বিশ—চালিশ—পচাশ—শও রূপেয়া?—ওৎনা তো ঐ আওরৎকা পয়েরকা জুতিকা দাম! আপনাকা গহনা আপনি ওয়াপোস ফের্‌তা লিয়ে লিন, আপনাকা জরুকে দিবেন—

সুন্দরী শেঠজীর দিক্ থেকে হাসিমুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বল্‌লে—ফিরিয়ে নিন বাবু আপনার উপহার, নিতে পারলুম না—শেঠজীর এটা পছন্দ হচ্ছে না—

যেখানে বিমল দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে দৃষ্টি ফিরিয়ে রমণী দেখ্‌লে, বিমল সেখানে নেই ; কৌতুকভরা চকিত দৃষ্টি চারিদিকে বুলিয়ে কোথাও বিমলকে দেখ্‌তে না পেয়ে তরুণী আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে—শেঠজী, বাবু পালিয়েছে, আমি এখন এটা নিয়ে কি করি ?

বিমল লজ্জা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ক্রুচের স্বয়ম্বরে বরমাল্য লাভের মায়া একেবারে ত্যাগ ক'রে ভিড়ের ভিতর ডুব দিয়ে পলায়ন করেছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

শেঠজী বুল-ডগের মতন হোঃ হোঃ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে তরুণীকে বল্‌লে—বাবু তোমাকে উটা দিয়ে দিয়েসে, তুমি লিয়ে লও।

রূপসী আবার হেসে উঠ্‌ল।

বিমল তখন মেলা ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে হোটেলে লুকিয়ে লজ্জা থেকে বাঁচ্‌বার জন্যে—আজই রাত্রের ট্রেনে সে দেশে রওনা হবে,—আর কোন্ মুখ নিয়ে সে মেলা দেখতে যাবে ? স্বর্ণকারের দোকানটির আশে-পাশে ঘুরেই তার কদিন কেটেছে, মেলার কিছুই তার দেখা হয় নি কিন্তু আর দেখ্‌বারও তার উপায় নেই। লজ্জায় তার চেতনা লুপ্ত হয়ে আস্‌ছিল, সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করছিল,—অর্থনাশ ও মনস্তাপই তার সার হ'ল। বিমল বাসে উঠে বাসায় ফিরছে, তার চোখের সাম্‌নে সারা

কল্‌কাতাটা মাতালের মতন টলমল কর্‌ছে, আর বিহ্বল বিবশতার ফাঁকে ফাঁকে তার কেবলই মনে হচ্ছে—হায় হায়, পাকা আম দাঁড়কাকে খায়! ঐ স্বর্ণ-প্রতিমা বাঁধা আছে কদাকার কুবেরের কারাগারে!

বিমল দেশে ফিরে গেছে। তার বন্ধুরা সব জিজ্ঞাসা করে—কেমন এগজিবিশন দেখ্‌লে?

বিমল কোনো মতে লজ্জা চেপে গম্ভীরভাবে কেবল বলে—চমৎকার! বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে—সে কি রকম?

বিমল বিব্রত হয়ে বলে—সে কথায় প্রকাশ করা আমার অসাধ্য, অনির্বচনীয়।

যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বিমলকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি চশমা নিলে কবে?

বিমল ম্লান মুখে কুণ্ঠিত হাসি ফুটিয়ে বলে—এইবার কল্‌কাতায় গিয়ে দৃষ্টির দোষটা ধরা পড়্‌ল।

প্রশ্ন হয়—এমন বাহারের চশমার সখ গেল যে?

বিমল লজ্জা পেয়ে বলে-কুঁজোর কি আর চিত হয়ে শুতে সাধ যায় না!

কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ অনুমান ক'রে বিমলের মনে সন্দেহ হয়, কল্‌কাতার বোকামীর খবরটা কি কোনো সূত্রে বরিশালে এসে হাজির হয়েছে? সে নাক-চিম্‌টা চশমা নীল কোট আর কমলা-রঙের শাল বাক্‌সয় বন্ধ ক'রে রেখে দিলে, সেগুলো ব্যবহার কর্‌তে এখন তার ভয়ানক লজ্জা করে।

কিন্তু হায় হায়! কই স্বয়ম্বরা সুন্দরী?

স্নুবর্ণ-গর্দ্দভ

তার বাপ-মা তার নাম রেখেছিলেন মহেশ। কিন্তু আমরা যারা তার সঙ্গে স্কুলে এক ক্লাসে পড়তাম, তারা নামের উচ্চারণটা একটু বদলে দিয়েছিলাম। আমাদের কাছে সে নাম পেয়েছিল মহিষ। তার উপাধি ছিল পালিত। মহিষ পালিত আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে পালিত মহিষ নামেও বিঘোষিত হতো। তার এই নাম-পরিবর্তনের একটু বিশেষ কারণ ছিল। মহেশের চেহারাটা ছিল ভীষণ কালো আর বিপুল মোটা; সে এমন অদ্ভুত রকমের কালো ছিল যে, তার চোখের সাদা অংশটা পর্যন্ত কালচে লাল রঙের ছিল এবং তাতে তার চোখের সাদা অংশও চোখের মণির সঙ্গে মিশে একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছিল, দূর থেকে বুঝতে পারা যেত না যে সে কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে। তার দাঁতগুলিও নিরন্তর পান-চিবানোর জন্য পানের ছোপ লেগে লালের থেকে কালোর দিকেই বেশি ঝুঁকেছিল এবং তার পুরু পুরু ঠোঁট দুখানিও পানের রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে আগুন-

ধরা টিকের মতো দেখাত। তার চেহারাতে কোথাও একটু সাদা রঙের লেশমাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যেত না। এর উপর সে আবার একটা কালো রঙের কোট বারো মাস গায়ে দিত, আর শীতকালে ঐ কালো কোটের উপর একটা খয়েরী রঙের র‍্যাপার জড়াত। তাই তাকে হঠাৎ দেখ্‌লে জমাট অন্ধকারের একটি প্রকাণ্ড পিণ্ড ব'লে ভ্রম হতো। মোটের উপর তার আপাদমস্তক ছিল একরঙা এবং তার মেজাজটা ছিল একরোখা আর একগুঁয়ে—যাকে বলে বদমেজাজী আর বদরাগী। এই সব গুণ মিলে মহিষের সঙ্গে তার সাদৃশ্যের সম্ভাবনা আমাদের মনে জাগিয়ে তুলেছিল এবং একবার এক জন যেই ঐ সাদৃশ্য-সম্ভাবনাটীকে প্রকাশ্যে প্রচার ক'রে দিলে, অমনি সেই সাদৃশ্যটাকে মেনে নিতে কারও একটু বিলম্ব বা দ্বিধা বোধ হলো না।

আমরা তাকে মহিষ ব'লে ডাক্‌তে শুরু কর্‌লে প্রথম প্রথম সে খুব চট্‌ত, মাষ্টারদের কাছে নালিশ কর্‌ত, আমাদের মার্‌বে ব'লে শাসাত, গালাগালি-মন্দ ত কর্‌তই। তার ক্রুদ্ধ রূপ দেখ্‌বার কৌতুকের আনন্দে আমরা তার গালাগালি বা আস্ফালন কখনও গ্রাহ্যের আমলেই আনিনি, আর মাষ্টারদের কাছে নালিশ করাতেও তাঁরা কোনো দিন আমাদের কিছুই বলেন নি, কেবল মহেশকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় ক'রে দিতেন যে তাঁরা আমাদের ধম্‌কে বারণ ক'রে দেবেন। মাষ্টাররা আমাদের কোনও দিন কিছুই বলেন নি ব'লে আমাদের সাহস ক্রমশঃ বেড়ে চলেছিল। এক দিন মহেশ আমাদের সাদর-সম্ভাষণ শুনে সন্তুষ্ট

হওয়ার বদলে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে একেবারে হেড মাষ্টারের কাছে গিয়ে নালিশ করলে। হেড মাষ্টার তার নালিশ শুনে হেসে বললেন—'দেখো বাপু মহেশ, তোমাকে দেখলেই আমাদেরই ঐ রকম কিছু বলবার ইচ্ছা প্রবল ও দুর্দম হয়ে ওঠে, তা ওরা সব ছেলেমানুষ, ওদের আর কি বলব বলো।' সেই দিন থেকে আর কোনো দিন মহেশ মাষ্টারের কাছে নালিশ করতে যায় নি এবং আমাদেরও আর গালাগালি-মন্দ করে নি; কিন্তু সে অনুদ্গত আগ্নেয়গিরির মতন অন্তরে অন্তরে জ্ব'লে জ্ব'লে উঠত, সেটা আমরা বেশ বুঝতে পারতাম—তার কালো পোড়া মুখখানা কৃষ্ণতর হয়ে উঠতে দেখে।

এর পর একদিন আমাদের পণ্ডিতমশায় মহেশের সঙ্গে মহিষ ছাড়া আর একটি পশুর সাদৃশ্য অকস্মাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেললেন। মহেশের লেখাপড়ার বুদ্ধিটা ছিল আকার-সদৃশ। পণ্ডিতমশায় সংস্কৃত শব্দরূপের পড়া জিজ্ঞাসা করছিলেন। তিনি মহেশকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা মহেশ, বলো ত লতা শব্দের ষষ্ঠির একবচনে কি হবে?" মহেশ অমনি তৎক্ষণাৎ চট ক'রে ব'লে ফেললে—"লতাস্য।" মহেশের বলবার সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিতমশায়ও মুখ ভেংচে ব'লে উঠলেন—"তুমি একটি গাধাস্য।" আমরা সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। আমি দমফাটা হাসির মধ্যে থেকে অনেক কষ্টে ছেঁকে কথা বাহির ক' পণ্ডিত মশায়কে বললাম—'পণ্ডিতমশায়, গাধা শব্দ ত পুংলিঙ্গ তা হলে ত গোপা কিংবা বলদা শব্দের মত রূপ হবে?' পণ্ডিতমশায় মুচকি হেসে

বল্লেন—"তাই ত হবে।" আবার ক্লাস শুদ্ধ ছেলে হেসে উঠ্‌ল—আরও দুটো জানোয়ারের সঙ্গে মহেশের সাদৃশ্য অকস্মাৎ ও অতর্কিতে আবিষ্কৃত হয়ে উঠ্‌ল দেখে আমি পণ্ডিতমশায়কে বল্লাম, "গাধা শব্দের যদি গোপা আর বলদা শব্দের তুল্য রূপ হয়, তা হলে তো ষষ্ঠীর একবচনে গাধাস্য হবে না; গোপা আর বলদা শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে তো হয় গোপঃ আর বলদঃ, তেমনি গাধা শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ হবে গাধঃ।" পণ্ডিতমশায় আমার বুদ্ধিচাতুর্য দেখে খুশী হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"গাধাস্য ত গাধা শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ নয়, ওটা একটা সমাসবদ্ধ পদ,—গাধঃ আস্যং মুখম্ ইব আস্যং যস্য সঃ গাধাস্য, অর্থাৎ গাধার তুল্য মুখখানি যার, সে গাধাস্য।" পণ্ডিতমশায়ের এই কথা শোন্‌বামাত্র ক্লাসে যে উচ্চ হাস্যরোল উত্থিত হলো, তাতে হেড মাষ্টার শুদ্ধ দৌড়ে দেখতে এলেন ব্যাপার কি।

মহেশ পণ্ডিতমহাশয়ের উপর ভয়ানক চ'টে গেল। পণ্ডিতমশায়ের উপর তার আগে থেকেই বিশেষ রাগ ছিল, তার কারণ ছিল, পণ্ডিত-মশায়ের বালবিধবা মেয়ে খেঁদীর প্রতি তার অনুরাগ এবং পণ্ডিতমশায়ের বাড়ীশুদ্ধ লোকের তার প্রতি বিষম বিরাগ ও বিরুদ্ধতা। এর ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস আমাদের জানা ছিল, তাই আমরা পণ্ডিতমশায় কর্তৃক মহেশের লাঞ্ছনায় বিশেষ কৌতুক অনুভব করেছিলাম। পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে খেঁদী আমাদের চেয়ে তো বয়সে বড় ছিলই, এমন কি, আমাদের ক্লাসের পাণ্ডা আর সর্দার পড়ো মহেশের চেয়েও বছর কয়েক বড়ই ছিল।

মহেশ তখন যদিও স্কুলের ক্লাস টেনে পড়ত, তথাপি তার প্রণয়লালসা বেশ টন্‌টনেই ছিল এবং রমণী সম্বন্ধে তার পৌরুষ বেশ প্রবলই ছিল। একদিন সে স্কুলে আস্‌বার সময় কেমন ক'রে খেঁদীকে দেখে ফেলেছিল, আর অমনি সে মজেছিল। তার চক্ষুরাগ অনুরাগে পরিণত হতে খুব বেশী বিলম্ব হয় নি। সে সেই দিন থেকে রোজই স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে খেঁদীকে একটিবার দেখ্‌তে পাওয়ার লোভে পণ্ডিতমশায়ের বাসার ধারে ঘুরঘুর কর্‌তে আরম্ভ করে। তার উপদ্রবে উত্যক্ত হয়ে খেঁদীই তার বাড়ীতে ব'লে দেওয়ার জন্যেই হোক অথবা খেঁদীদের ঝি নিজে থেকেই মহেশের মুগ্ধ নায়কত্ব দেখে বিরক্ত হয়েই হোক, এক দিন মহেশকে পরম সাদর সম্ভাষণ করেছিল—"আরে মলো মুখপোড়া বাঁদর ছোঁড়া, ঘুরঘুর কর্‌বার আর জায়গা পাও না? যমের বাড়ীর দরজা কি বন্ধ হয়ে গেছে? দাঁড়া তো মুখপোড়া, তোর কালা মুখখানাকে পুড়িয়ে আরোও কালা ক'রে দি! ঝেঁটিয়ে তোর ছোঁকুছোঁকানি ঝেড়ে দেবো না?" তার পর মহেশ সেই পথ একেবারে ছেড়ে না দিলেও খুব ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে সেই পথ দিয়ে যাতায়াত কর্‌ত।

যে দিন আমাদের ক্লাসে মহেশকে পণ্ডিতমশায় গাধাস্য ব'লে সম্ভাষণ করলেন, সেই দিনই তার পরের ঘণ্টায় হেড মাষ্টার আমাদের সেক্স-পিয়ারের 'মিডসামার নাইট্‌স্ ড্রিম' নাটকের কাহিনীটি পড়ালেন। এই গল্পের মধ্যে নিক বটমের গাধার মুখোস পরার বিবরণ যখন পড়া চল্‌ছিল, তখন আমাদের হাস্য সংবরণ ক'রে রাখা নিতান্তই দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল।

আমরা এক এক জন মহেশের দিকে চেয়ে দেখি আর হাসির দমকে আমাদের সকলের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়। হেড মাষ্টার সাম্‌নে থাকায় আমরা হাসি চাপ্‌তে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমাদের হাসি চাপ্‌বার চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের হাসি ফোয়ারার জলের মতন দমকে দমকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছিল। হেড মাষ্টার মনে কর্‌ছিলেন যে, আমরা হয় তো টাইটানিয়ার দুর্দশা আর বটমের বোকামি দেখে হাসছি। কিন্তু আমরা যে কি জন্য হাস্‌ছিলাম, তা হাড়ে হাড়ে বুঝে মহেশ ক্রুদ্ধ মহিষেরই মত ভেঁাষ ভেঁাষ কর্‌ছিল।

সেই দিন মহেশ স্কুল থেকে বাড়ীতে গিয়েই সঙ্কল্প কর্‌লে যে,সে আর আমাদের স্কুলে কিছুতেই পড়্‌বে না, সে তার মামার কাছে চ'লে যাবে। তিনি গৌহাটীতে থাকেন। কিন্তু আবার গৌহাটী! গাধার অপবাদ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে শেষকালে গৌহাটীতে যাওয়াও তো বিশেষ নিরাপদ নয়। সেই দেশটাকেই আবার কামরূপ-কামাখ্যা বলে,—যেখানে গেলে লোককে একদম ভেড়া বানিয়ে দেয়। কিন্তু ভেড়া তো বানায় সেখানকার সুন্দরী সব মেয়েরা! তা নেহাং মন্দ কি! আহা! খেঁদী যদি তাকে ভেড়া বানিয়ে পোষ ম্যানিয়ে তার কাছে রেখে দিত, তা হ'লে আর সেই হাঁড়িমুখো খ্যাংরাখাকী ঝি মাগী মুখ-ঝাম্‌টা দিতে পার্‌ত না, আর সে-ও নির্ভয়ে খেঁদীর কাছে কাছে ঘুরঘুর কর্‌তে পার্‌ত।

মহেশ এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়ল, আর স্বপ্নের ইন্দ্রজালে অকস্মাৎ সে অভাবিতের রাজ্যে চ'লে গেল।

বন-জ্যোৎস্না

মহেশ আমাদের স্কুল ছেড়ে দিয়ে গৌহাটিতে চ'লে গেছে। সে কামরূপ-কামাখ্যা দেশে গিয়ে সুন্দরীর জাদুতে ভেড়া বন্‌বার জন্য আগ্রহ-ভরা মন দিয়ে গৌহাটীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছে। একটা গলির মধ্যে ঢুকেই সে দেখ্‌লে, একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে খেঁদীর ঝি মোহিনী। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাকে দেখ্‌বামাত্র মোহিনী আজ আগের মতন মার মার শব্দে তেড়ে এলো না, আর তার সেই কদাকার মোটা বুড়ো মূর্ত্তি আজ জাদুর দেশের মন্ত্রগুণে প্রকৃতি মোহিনী মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে—সে ষোড়শী সুন্দরী, তার মাথার চুলগুলি কালো রেশমের গুচ্ছের মতন কুঞ্চিত তরঙ্গে তার কাঁধ-পিঠ আচ্ছন্ন ক'রে নিতম্ব ছাপিয়ে পড়েছে। তার সেই ফুরো ফুলো গোল থল্‌থলে গাল দুটি আপেলের গায়ের মত লাল ও নিটোল হয়েছে। তার কপালতটটি ফুটির গায়ের মত গোলাপীতে হল্‌দে ছোপে মেশানো গৌরবর্ণ ধারণ করেছে। তার সেই কোটরগত কুকুরচোখ পটলচেরা চোখে পরিণত হয়েছে; সেই টানা টানা চোখের কোলে মিশমিশে কালো ঘন বক্রাগ্রপক্ষ্মপংক্তি চোখের কোলে কালো সুর্মারেখার মতন মনোহর দেখাচ্ছে। তার বাঁ পায়ে আর সেই গোদ নেই, তার পা হয়েছে চরণকমল, আর তার গোবর-মাখা হাত দু'খানা হয়েছে কর-কিশলয়। তার খোঁপায় গোলাপফুল গোঁজা, মনে হচ্ছে, যেন তার গায়েই রং কর্‌বার সময় বিধাতার তুলির মুখ থেকে এক ফোঁটা রং ছিট্‌কে গিয়ে চুলের উপর পড়েছে, চুলের কৃষ্ণত্ব আর গায়ের গৌরত্ব পরস্পরের তুলনায়

সুন্দরভাবে ফুটে উঠ্‌বে ব'লে। তাকে দেখ্‌বামাত্র মোহিনী মন-ভুলানো মধুর হাসি তার আল্‌তাপাটী শিমের মতে পাৎলা রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দুখানিতে মাখিয়ে বল্‌লে,—"এসো, এসো, মহিষবাবু এসো।" আজকে মোহিনী তাকে মহিষ ব'লে সম্বোধন কর্‌লেও তার রাগ হলো না, সেও হেসে বল্‌লে,—"মোহিনি, তুমি এখানে কেমন ক'রে কবে এলে, আর এমন সুন্দরই বা হলে কেমন ক'রে?" মোহিনী আবার হাস্‌লে। মহেশ দেখ্‌লে, মোহিনী অপরূপ রূপসী হলেও তার মুখের মধ্যে একটিও দাঁত নেই, সমস্ত মুখটা ফোক্‌লা। এই দেখেই মহেশের সারা মনটা ঘিন-ঘিন ক'রে উঠ্‌ল, তখন তার মনে হলো, মোহিনী যেন পোকা-ধরা পাকা আমটি—বর্ণ, বাস, রস মন ভুলায়, কিন্তু কিলবিলে পোকার কথা মনে হলেই আর সে দিকে তাকাতে প্রবৃত্তি হয় না। মোহিনী হাসিমুখে বল্‌লে,—"তোমার আসার আশাতেই তো আমাদের এতদূর আসা। আমরা তো জানি যে, 'আসিবে তুমি আসিবে, থেঁদীর হৃদয়ে রাজিবে'।" মহেশ বল্‌লে,—"শুধু তুমি নও, থেঁদীও এসেছে তা হলে! থেঁদী কৈ?" মোহিনী বল্‌লে,—"অত উতলা কেন, থেঁদীকে তো পাবেই, কিন্তু আমাকে কি অমন্দ দেখ্‌তে যে পছন্দ হচ্ছে না?" মহেশ আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌লে,—"না, তুমি তো মন্দ নও, তবে কি না যো যস্য হৃদ্গং—বুঝ্‌লে কি না মোহিনি।" মোহিনী বল্‌লে,—"থেঁদী তো এখন বাড়ীতে নেই, সে গেছে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে তোমাকেই এখানে টেনে আন্‌বার মন্ত্র-তন্ত্র তুকতাক তাবিজ-কবচ জোগার কর্‌তে। তা সে অনেকক্ষণ গেছে,

সে এলো ব'লে। তুমি ঘরে বস্‌বে এসো।" মহেশ ভয়ে ভয়ে মুখ শুকিয়ে বল্‌লে,—"কিন্তু পণ্ডিত মশায়। তিনি কিছু বল্‌বেন না? সন্ধিবিচ্ছেদ কর্‌তে ব'লে হুঙ্কার কর্‌বেন না তো।" মোহিনী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—"তিনি ত এখানে আসেন নি, কেবল আমরা দুজনে এসেছি। যতক্ষণ খেঁদী না ফির্‌ছে, ততক্ষণ তো আমিই আছি।" মহেশ মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—তা তো আছ, কিন্তু দাঁত কটা যদি গজাত, তাহলে আর আমার কোনো আপত্তি থাক্‌ত না। সুন্দর হওয়ার এত আয়োজনই যদি কর্‌তে পেরেছিলে, তবে গোটা বত্রিশেক দাঁত যোগাড় করা তোমার পক্ষে এমন কি শক্ত ব্যাপার হয়েছিল? আসল নিজস্ব দাঁত না জুটুক, অন্ততঃ দু-পাটী দাঁত বাঁধিয়ে নিতে তেমন কি বেশী খরচ পড়্‌ত? আর কথা-গুলো যদি ওরই মধ্যে একটু সুশ্রাব্য আর বিশুদ্ধ রকমের ক'রে নিতে পার্‌তে, তা হ'লে তোমারও লাভ আর আমারও লাভ এক সঙ্গেই হতে পার্‌ত।

মহেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছে দেখে মোহিনী ফোকলা মুখে গান গেয়ে উঠ্‌ল—

"এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।"

মহেশ তার সর্বদেহে মনে যেন একটা কিসের শুড়শুড়ি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল, তার অঙ্গ জরজর শিথিল অম্বর, মন বল্‌তে চাইছিল 'সখী আমায় ধরো ধরো।' তার মনে হতে লাগ্‌ল, সবাঙ্গে যেন হাজার হাজার

পিঁপড়ে চ'লে বেড়াচ্ছে, সে গায়ের দিকে চেয়ে দেখেই শিউরে উঠ্‌ল, তার সর্বাঙ্গে কোঁকড়া কোঁকড়া লোম গজাচ্ছে। সর্বনাশ! তা হলে সে কি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভেড়া ব'নে যাচ্ছে না কি! হায় হায়, "কোথায় আনিল আমারে, কোথা রইল মাতা পিতা বন্ধু সকলে!" মহেশের মনে একটা আতঙ্ক হলেও তার মনে একটা অনির্বচনীয় আনন্দও অনুভূত হচ্ছিল, যে আনন্দ অনুভব করে গ্রীষ্মজ্বালায় দগ্ধ শুষ্ক তৃণশূন্য পৃথিবী, যখন নব বর্ষার প্রথম বর্ষণে তার সর্বাঙ্গে পুলক-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে কোমল শষ্পের উদ্গম হতে থাকে। মোহিনীর মধুর হাস্যধারায় অভিষিক্ত হয়ে মহেশেরও সর্বাঙ্গ পুলকে লোমহর্ষণে ছেয়ে যেতে লাগ্‌ল। মহেশ দেখলে, তার দেহে যে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘট্‌ছে, তা পশুর লোম নয়, পাখীর পালক। মহেশ হর্ষ-বিষাদে বিস্ময়ে কৌতুকে বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আচ্ছা মোহিনী, তুমি কি বল্‌তে পারো, আমাকে তুমি বা তোমরা কি বানাচ্ছ, অথবা আমি কি প্রাণীতে পরিণত হতে চলেছি?" মোহিনী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। মহেশ সবিস্ময়ে দেখ্‌লে যে, মোহিনীর মুখভরা দাঁত—মণিদর্পণের মতন ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে, সে দাঁতের শোভার কাছে কোথায় লাগে ছার মামুলি কবিত্বের উপমার সামগ্রী দাড়িম্ববীজ আর মুক্তা-পংক্তি! সে ভাবতে লাগ্‌ল, হয় তো বা সে যে মনে মনে মোহিনীর নির্দন্ত মুখের প্রতি ঘৃণা অনুভব করেছিল, সেই কথা মন্ত্রশক্তিতে মোহিনী জান্‌তে পেরে তাকে এই দণ্ড দিয়েছে। কিন্তু মহেশের এই রূপান্তর নেহাৎ মন্দ লাগ্‌ছিল না। সে ছিল মানুষের

আকৃতির, নাম পেয়েছিল মহিষের ও গাধার? আর এখন সে হতে চলেছে পাখী। এই অভিজ্ঞতার বিচিত্রতা মন্দ কি! মহেশ গান গেয়ে উঠ্‌ল—

"ওগো বঁধু, তুমি কি মায়া জানো,
পলকে পালক গজায়ে আনো।"

মহেশ বল্‌লে, "আচ্ছা মোহিনী, আমাকে চিরকাল এই রকম পেঁচা হয়ে থাকৃতে হবে?"

মোহিনী বল্‌লে—"না, তুমি ইচ্ছে কর্‌লেই আবার তোমার কৃষ্ণকান্তি ফিরে পাবে তার উপায়ও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমার চুলে যে রকম লাল গোলাপ দেখছ্‌, সেই রকম গোলাপফুল যদি চিবোও, তা হলেই তুমি মানুষ হয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান, গায়ে যেন ধূপের ধোঁয়া লাগে না, তা হ'লে পেঁচা থেকে আবার গাধা হয়ে যাবে।"

এতক্ষণে মহেশের গা-ময় পালক গজিয়ে উঠেছিল, তার পাখায় পাখায় ওড়বার আগ্রহ তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল, সে আর নিজেকে স্থির ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না। এমন সময় তাকে দেখে একটা কাক ছুটে এল তাকে ঠোক্‌রাতে, সেই কাকটার মুখখানা দেখ্‌তে ঠিক আমাদের পণ্ডিত মশায়ের মতো, যিনি তাকে সবচেয়ে বেশী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জ্বালাতন কর্‌তেন। কাকের ভয়ে মহেশ আর সেখানে তিষ্ঠতে পার্‌লে না, সে উড়ে যেতে যেতে ব'লে গেল—"মোহিনী, খেঁদীকে বোলো, আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পার্‌লাম না, রাত্রি হ'লে কাকগুলো

:চাখের মাথা খেয়ে বাসায় লুকালে আমি একবার এসে থেঁদীকে দেখে
াাব, অবশ্য যদি আবার তোমাদের বাসা চিনে আস্‌তে পারি।”

মহেশ পেঁচা হয়ে উড়ে চল্‌ল ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে না জানি সে কোন্
:দশে। উড়্‌তে উড়্‌তে গিয়ে উপস্থিত হলো কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে।
:সখানে গিয়ে দেখ্‌লে, থেঁদী ব'সে স্বয়ং কামাখ্যাদেবীর কাছে মায়া-মন্ত্র
শখ্‌ছে। মহেশের মন খুশী হয়ে গেল যখন সে শুন্‌লে যে থেঁদী
কামাখ্যাদেবীকে বল্‌ছে—“মা, আমাকে এমন জোরালো মন্ত্র শিখিয়ে দাও
য, সেই মন্ত্র আওড়াবা মাত্র মহেশ এসে আমার কাছে উপস্থিত হয়।”

মহেশ এতক্ষণে বুঝ্‌তে পার্‌লে, কেনই বা সে পেঁচা হয়েছে আর
কনই বা সে উড়্‌তে উড়্‌তে একেবারে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে এসে
পস্থিত হয়েছে। এ-সমস্তই কামাখ্যাদেবীর বরের মহিমা; তিনি
ন্তর্যামিনী, আগেই জেনেছিলেন যে, তাঁর আরাধিকা থেঁদী তাঁর কাছে
হেশের সঙ্গে সত্বর মিলনের বর চাইবে এবং মহেশকে থেঁদীর সঙ্গে সত্বর
িলিত কর্‌তে হলে তাকে হয় এয়ারোপ্লেনে চড়িয়ে আনা দরকার।
কন্তু দেবতাদের যদিও পুরাকালে পুষ্পক রথ ছিল, সে রথ তো এখন
য়দানবের বংশধর ইউরোপের লোকেরা একচেটে ক'রে নিয়েছে,
াবতাদের এমন পাখীর পাখাই একমাত্র সম্বল আছে। মহেশ যে পেঁচা
'নে গিয়েছিল, তার জন্য তার মনে আর একটুও আফশোষ রইল না।
:হেশ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ব'লে উঠল—“আমি এসেছি গো এসেছি,
ন দিতে এসেছি।”

বন-জ্যোৎস্না

মহেশের পেচক-কণ্ঠের গান শুনেই খেঁদীসুন্দরী গেয়ে উঠল—

"পেঁচার রূপে তোমার অভিসার,
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার !
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি', হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার ।
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার !
অনেক দিন দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ তাকিয়ে ছিনু তাই,
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হয়েছ তুমি পার,
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার ।"

মহেশ খেঁদীকে দেখেই বিহ্বল হয়েছিল, তার উপর আবার স্বকর্ণে শুনেছিল যে, সে কামাখ্যাদেবীর কাছে বর চাচ্ছে তারই সঙ্গে ত্বরিত মিলন, তার উপর আবার খেঁদীর মধুর কণ্ঠের আহ্বান শুন্‌লে একেবারে গানে। মহেশ আর আপনাতে আপনি থাকল না, সে আত্মহারা হয়ে

আর আপনাকে সম্বরণ ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ল না, সে উড়ে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল !

কিন্তু মন্দিরের মধ্যে খেঁদী ধূপ-ধূনা জেলে কামাখ্যাদেবীর পূজা করছিল, কত কত কামাখ্যার উপাসক উপাসিকা বাসনার ধূপ জ্বালিয়ে মন্দিরটিকে ধূমাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, সে-দিকে মহেশের মন দেবার মত হুঁস ছিল না। তাই সে মোহিনীর সাবধান হওয়ার উপদেশ একদম ভুলে গিয়ে ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল। কিন্তু যেই না তার গায়ে ধূপের ধোঁয়া লাগা, আর অমনি তার গায়ের পালক কটা কটা কড়া লোমে পরিবর্তিত হয়ে গেল, তার থেব্‌ড়া চেপ্টা মুখ লম্বা হয়ে গেল, তার কান দুটো হলো লম্বা আর পায়ের নখগুলো গুটিয়ে হয়ে গেল শক্ত চারখানা খুর। সে হয়ে পড়ল ছোট্ট একটি গাধা।

গাধা হয়েই মহেশ ঘ্যাঁতো ঘ্যাঁতো ক'রে ডেকে বল্‌লে—"হায় হায় খেঁদী এ আমার কি হ'ল, তুমি যদি রূপান্তরের মন্ত্র-তন্ত্র না জানো তো এই বেলা চট ক'রে কামাখ্যাদেবীর কাছ থেকে জেনে নাও, নইলে শেষে কি আমাকে তোমার জন্যে চিরজন্ম গাধা হয়েই থাকৃতে হবে না কি।"

খেঁদী বল্‌লে—"তোমার ভয় নেই, আমি কামাখ্যাদেবীর কৃপাতে রূপ-বদলের সব তুক-তাকই জানি। আমি এখনই তোমাকে মানুষ বানিয়ে দিচ্ছি।"

কিন্তু দেবীর মন্দিরের ভিতর অপবিত্র জীব গাধাকে চীৎকার করতে

শুনেই মন্দিরের পাণ্ডারা বড় বড় লাঠি উঁচিয়ে দৌড়ে এলো এবং সেই সময়ে খেঁদীর বাবা পণ্ডিত মশায়ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, কাজেই খেঁদী আর মহেশকে মানুষ ক'রে দিতে পার্‌লে না। যাই পাণ্ডারা গাধা অপবিত্র জীব ব'লে তাকে ছুঁলে না, তাই মহেশ এ-যাত্রা কেবল মাত্র তাড়া খেয়েই বেঁচে গেল, নইলে ঐ নাদন-পেটা হলে তার হাড় গুঁড়ো হয়ে যেত।

মহেশ মন্দিরের বাহির হয়ে মহা দুর্ভাবনায় পড়্‌ল, সে কেমন ক'রে আবার মনুষ্যরূপ ধারণ করতে পার্‌বে। সে যখন পেঁচা হয়েছিল, তখন মোহিনী তাকে মানুষ হওয়ার কৌশলটি জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু খেঁদী তাকে গর্দভরূপ পরিবর্ত্তনের উপায় বল্‌তে পারার আগেই তাকে তার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিলে, এখন যদি তার সঙ্গে খেঁদীর আর দেখা না হয়, তা হ'লে তো এ-জন্মটা গাধা হয়েই কাটাতে হবে।

খেঁদী তার পিছনে পিছনে তার সন্ধানে আস্‌বে আশা ক'রে গর্দভরূপী মহেশ ধীরে ধীরে চল্‌ছিল। এমন সময় এক জন ধোপা কাপড় নিয়ে ঘাটে কাচতে যাচ্ছিল। সে একটা ছুটো বে-ওয়ারিস গাধা দেখেই তাকে ধ'রে তার পিঠে কাপড়ের বস্তাটা চাপিয়ে দিলে। ভদ্রলোকের ছেলে মহেশের মোট বওয়া অভ্যাস কোনো কালেই ছিল না, বেচারা পিঠে বোঝার ভারে মন্থরগতিতে পথ চল্‌তে লাগ্‌ল; একেই গাধা শুধু মন্দমতি নয়, মন্দগতিও, তাতে আবার তার পিঠে অনভ্যস্ত ভার চাপানো হয়েছে। সে চল্‌ছে না দেখে ধোপা তাকে প্রথমে মুখে

চ্যাঃ চ্যাঃ শব্দ ক'রে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তাতেও তার পদক্ষেপ বিশেষ দ্রুত হ'ল না দেখে সেই ধোপা পথের ধারের একটা গাছ থেকে পাতাশুদ্ধ একটা ডাল ভেঙে নিয়ে তাকে পপাপপ ক'রে মারতে মারতে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

মহেশ যদিও গাধা হয়েছিল, তবু তার মানুষের বোধশক্তি লোপ পায় নি। সে সব কথা মানুষের মতনই বুঝতে পারছিল। ধোপার মার খেয়ে মহেশের অত্যন্ত অপমান বোধ হচ্ছিল, সে সুযোগ খুঁজতে লাগল, কেমন ক'রে ধোপাটাকে ক'ষে এক চাট লাগিয়ে দেবে।

ধোপা মহেশ-গাধাকে নিয়ে নদীর ঘাটে গেল। তখন মহেশ দেখলে যে, মোহিনী সেই ঘাটে স্নান করতে এসেছে। মহেশ ঘঁ্যাতো ঘঁ্যাতো ক'রে আকুল আগ্রহে ডাকতে ডাকতে মোহিনীর দিকে দৌড়ে চলল। গাধা পালায় দেখে ধোপা তার হাতের ছপটি নিয়ে তাকে তেড়ে মারতে মারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। মহেশ চাট ছুড়ে চেঁচিয়ে অনেক ধস্তাধস্তি করলে, কিন্তু কিছুতেই ধোপার হাত থেকে অব্যাহতি পেলে না। ধোপা বেওয়ারিস গাধা পেয়ে গিয়ে তাকে আর ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না।

মোহিনী কিন্তু মহেশকে দেখেই চিনতে পেরেছিল, সেও তো কামরূপের তন্ত্র কিছু কিছু জানে। সে চেঁচিয়ে মহেশকে ব'লে দিলে— "রক্ত জবা গায়ে ঠেকলেই নিজের রূপ ফিরে পাবে।"

মহেশকে নিয়ে ধোপা তার বাড়ীতে গেল।

বন-জ্যোৎস্না

সে দিন ধোপাপাড়ায় ছিল শীতলা-পূজা। ধোপা একটা গাধা ধ'রে এনেছে খবর পেয়ে পাড়ার মাতব্বর লোকেরা বল্লে—"গাধা তো মা শীতলার বাহন, ঐ গাধাটার পিঠে ঠাকুরকে চড়িয়ে চলো শহর প্রদক্ষিণ ক'রে আসা যাক।"

এই প্রস্তাবটা সকলেরই মনঃপূত হলো। মহেশেরও মনঃপূত হ'ল, কারণ, তার আশা হ'তে লাগ্‌ল, যখন শীতলা ঠাক্‌রুণ পিঠে চাপ্‌বেন, তখন তাঁর গলায় নিশ্চয় জবাফুলের মালা থাক্‌বে, আর কোনো রকমে সেই মালা গায়ে ঠেকিয়ে নিতে পার্‌লেই গাধার খোলস ছেড়ে মানুষ হতে পারা যাবে, আর চাই কি দেবীর উপযুক্ত বাহন কর্‌বার জন্যে তাকেই জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে সাজিয়ে দিতে পারে। তা হলে তো তাকে কোনো কষ্টই কর্‌তে হবে না।

মহেশকে ফুলের মালা দিয়ে সাজালে, কিন্তু সে মালা ঘেঁটু ফুলের। আর দেবী শীতলার বাহন তাকে কর্‌লে বটে, কিন্তু তার পিঠে শীতলা ঠাক্‌রুণকে চড়ালে না, তাকে জুতে দিলে একখানা ছোট রথে, আর সেই রথে বসালে শীতলা দেবীকে।

মহেশ আশার মোহে প্রলুব্ধ হয়ে শান্ত-শিষ্টভাবেই মা শীতলার রথ টেনে নিয়ে চল্‌ল। তার আশা হচ্ছিল যে, হয় তো কোথাও ঠাক্‌রুণকে নামিয়ে ফুল দিয়ে পূজা করবে এবং সেই পূজার ফুলের মধ্যে নিশ্চয় জবাফুল থাক্‌বেই। তখন সে কোনো সুযোগে নিজেকে রথের জোত থেকে মুক্ত ক'রে অথবা রথশুদ্ধই সেই জবাফুলের উপর গিয়ে লুটিয়ে

পড়্‌বে এবং গর্দ্দভরূপ ছেড়ে মনুষ্যরূপ ধারণ ক'রে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে।

মহেশ গাধা হলেও তার মনুষ্যবুদ্ধি তাকে একেবারে ত্যাগ করে নি। তাই সে স্বেচ্ছায় নিজেকে শীতলার রথে জুত্‌তে দিলে। তার পর সে বিনা তাড়নাতেই রথ টেনে নিয়ে চল্‌ল। কিন্তু তার মন প'ড়ে রইল কখন কোন্ সুযোগে সে শীতলার নির্মাল্য জবাফুলের উপর লুন্ঠিত হয়ে পড়্‌তে পার্‌বে।

মহেশ দেখ্‌তে লাগ্‌ল, এক জায়গায় একটা বেদীর উপর শীতলাকে বসিয়ে পুরোহিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁর পূজা করছে এবং সেই পুষ্প-সম্ভারের মধ্যে জবাফুলও আছে প্রচুর কিন্তু ধোপারা তাকে রথ থেকে মুক্ত ক'রে দেয় নি, সে রথে জোতাই আছে। পূজা সাঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত তাকে ঐ অবস্থায় অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু মহেশ আর ধৈর্য্য ধ'রে বিলম্ব সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিল না। তার চোখের সাম্‌নে রয়েছে রাশি রাশি জবা ফুল, যার স্পর্শমাত্রই সে মানুষ হয়ে যেতে পারে, অথচ তাকে বন্দী-দশায় নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। মহেশ ভাবতে ভাবতে মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল। সে হঠাৎ রথশুদ্ধ হুড়মুড় ক'রে শীতলার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু এমনি তার দুরদৃষ্ট যে, তার উদ্যম থেকেই বহু লোক হৈ হৈ ক'রে লাঠি-ঠেঙা নিয়ে তার উপরে এসে মারমুখো হয়ে পড়্‌ল এবং তাকে গাধাপেটা ক'রে শীতলার কাছ থেকে ফিরিয়ে দিলে। তার ফল হলো এই যে, রথখানা গিয়ে পড়ল শীতলার প্রতিমার উপরে, আর প্রতিমা

হলো চূর্ণ ও পূজার নির্মাল্য হলো ছত্রাকার এবং এই অপরাধের জন্য তার পিঠে যে যষ্টিবৃষ্টি হলো, তাতে তার মানুষ হওয়ার দুশ্চেষ্টা করবার সাহস আর একটুও অবশিষ্ট রইল না। হায় হায়, তার এমনি মন্দ ভাগ্য যে, ঠাকুরতলার উপর গিয়ে পড়ল কি না জড় রথখানা, আর তার উপরে এসে পড়ল জড় যষ্টির প্রচণ্ড প্রহার! জবাফুল যে দূরে সেই দূরেই থেকে গেল!

মহেশকে প্রহারে জর্জ্জরিত ক'রে ধোপারা বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা খোঁটায় বেঁধে রেখে দিলে, সে দিন আর তার ভাগ্যে ঘাস-জল কিছুই জুটল না।

মহেশ মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে স্থির করলে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে? অতএব যত দিন না তার মানুষ হওয়ার সুযোগ তার কাছে আপনি এসে উপস্থিত হবে, তত দিন সে আর পুরুষকারের দ্বারা ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কোনো চেষ্টাই করবে না।

পরদিন থেকে মহেশ অতি নিরীহ গর্দ্দভ হয়ে গেল। ধোপা তার পিঠে কাপড়ের বস্তা চাপিয়ে দিলেই সে বিনা নির্দেশে ও বিনা চালকে ঘাট থেকে ঘরে অথবা ঘর থেকে ঘাটে যাতায়াত করে। ধোপা যদি কোনো কাপড় বেছে বাহির করবার কথা মুখ ফুটে বলে, তবে মহেশ অমনি সেই কাপড় বেছে বাহির ক'রে দেয়। কোন কাপড় কেউ চাইলে সে-ই এনে দেয়। এইরূপে তার বুদ্ধির খ্যাতি ধোপা-মহলে রাষ্ট্র হয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমাদরও বেড়ে চলল।

ধোপা যতই মহেশের বুদ্ধির পরিচয় পেতে লাগ্‌ল, ততই সে মহেশকে বিশ্বাস ক'রে তার উপরে নির্ভর করতে লাগ্‌ল। এক'দিন সে বল্‌লে যে,—"এই গাধা, তুই একলা কাপড় নিয়ে প্রসন্ন পণ্ডিতের বাড়ীতে দিয়ে আস্‌তে পারবি ?"

মহেশ মাথা নেড়ে জানালে, সে খুব পারবে। প্রসন্ন পণ্ডিত যে তার খেঁদীরই বাবা! তার বাড়ীতে সে আবার যেতে পারবে না? খেঁদীর কাছে একবার যেতে পাওয়ার আনন্দে ও খেঁদীকে ধ'রে তার মনুষ্যরূপ ফিরিয়ে পাওয়ার একটা কিছু বন্দোবস্তও ক'রে ফেল্‌তে পারার আশায় মহেশ তাড়াতাড়ি নিজেই খেঁদীদের কাপড়গুলি বেছে বেছে এনে ধোপার কাছে রাখ্‌তে লাগল। ধোপা গাধার এই অসাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে তো একবারে অবাক্। সে মহেশের দাড়ি ধ'রে আদর ক'রে বল্‌লে—"তুই আমার সোনার গাধা!"

মহেশ সব কাপড় একে একে বেছে এনে দিলে। ধোপা কাপড়গুলি বোচকা বেঁধে মহেশের পিঠে চাপিয়ে দিলে। মহেশ অমনি গুট্‌গুট্‌ ক'রে খেঁদীদের বাড়ীর দিকে চল্‌ল। মহেশ কোথায় যায়, কি ক'রে দেখ্‌বার জন্যে কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে ধোপাও পিছনে পিছনে দূরে দূরে থেকে গা-ঢাকা হয়ে মহেশকে অনুসরণ ক'রে চল্‌ল। ধোপা আশ্চর্য হয়ে দেখ্‌লে মহেশ প্রসন্ন পণ্ডিতের বাসার সাম্‌নে গিয়েই উচ্চরবে চিঁপো চিঁপো ক'রে ডেকে উঠ্‌ল। সেই ডাক শুনেই বাড়ীর ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি খেঁদী সিড়িমণি বেড়িয়ে এলো, আর অমনি মহেশের গলা

জড়িয়ে ধ'রে তার মুখে চুমুর পর চুমু খেতে লাগ্‌ল। ধোপা তো একেবারে অবাক্‌। বামুনের বিধবা মেয়ে খেঁদী, সে কি না গাধাকে শুধু ছোঁয়া নয়; তার মুখে চুমো খেতে লেগেছে!

মহেশের ইচ্ছা হচ্ছিল যে, সে মুখ ফুটে মানুষের মতন কথা ক'য়ে *খেঁদীকে বলে যে, সে তার গাধার রূপ বদ্‌লে তাকে মানুষ বানিয়ে দেয়। কিন্তু সে কথা বল্‌তে চেষ্টা করলেই তার মুখ থেকে গাধার ডাকই বাহির* হয়, মানুষের কথা সে বুঝ্‌তে পারে, ভাব্‌তে পারে, কিন্তু কিছুতেই বল্‌তে পারে না কেন? এ কি দুর্দৈব! কিন্তু গাধার চেহারা বদ্‌লাতে বল্‌তে না পারলেও, মহেশের মনে অপার আনন্দের ঢেউ খেলছিল, তার মনে হচ্ছিল—সে যেন মিড সামার নাইট্‌স্‌ ড্রিমের বটম, আর খেঁদী তার টাইটানিয়া। মনুষ্যরূপে থাক্‌তে এ সৌভাগ্য তো তার এক দিনও হয় নি। অতএব মনুষ্যরূপ লাভ করার চেয়ে এই গাধারূপে এ জন্মটা কাটিয়ে দিতে হ'লেও তার বিশেষ কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু তাকে আরো আনন্দিত ক'রে খেঁদী তার লম্বা কানের কাছে মুখ এনে বল্‌লে—"মহেশ, তুমি কিছু ভেবো না, আমি তোমাকে ভেড়া বানিয়ে আমার কাছে রাখ্‌ব, আর যখন কেউ দেখ্‌বে না, তখন তোমাকে মানুষ বানিয়ে আমরা সুখে ঘর করণা করব। তুমি এখন কিছুদিন গাধা হয়ে ধোপার বাড়ীতেই থাক।"

মহেশ মহানন্দে আবার রাসভকণ্ঠের চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

গাধার পুনঃ পুনঃ চীৎকার শুনে প্রসন্ন পণ্ডিত অপ্রসন্ন হয়ে লাঠি

নিয়ে বাইরে তেড়ে এলো, গাধার উদ্দেশে ভর্ৎসনা করতে করতে—"আরে খোলো হতভাগা গাধা, চীৎকার করবার আর জায়গা পাও নি? তোর চীৎকারের জ্বালায় আমার জমাখরচের ঠিক দিতে ভুল হয়ে গেল।"

মহেশ পণ্ডিত-মশায়ের হাতে এর আগে দু'চার-বার বেত খেয়ে তাঁর হাতের মারের আস্বাদ ক'রে রেখেছিল। তার পরে ধোপার হাতের লাঠির বাড়ি খাওয়ার আস্বাদটাও নিতান্ত মন্দ। তাই সে পণ্ডিত মশায়কে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতে দেখে পিঠের বোঝা ঝেড়ে ফেলে খেঁদীর মমতা ভুলে চোঁচা দৌড় দিলে!

বেচারার গর্দভজীবনে সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। সে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে চিন্তা করতে লাগল যে, আর সে গাধা হয়ে থাকবে না, যেমন ক'রেই হোক সে জবাফুল ছুঁয়ে আবার মানুষ হবে, তাতে যদি সে আর জীবনে কখনো খেঁদীকে না দেখতে পায় তবুও।

মহেশ ধোপার বাড়ীতে ফিরে যেতে যেতে দেখলে, পথের পাশে এক সাহেবের বাগানঘেরা বাংলাঘর রয়েছে। সেই বাগানে সারি সারি জবাগাছ লাল নীল হলদে সাদা নানা বর্ণের ফুলে সেজে ঝলমল করছে। মহেশ দেখলে, সাহেবের বাংলার গেটটাও খোলা রয়েছে। সে অমনি যা থাকে কপালে ভেবে বেগে বাগানে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সেই গেটের পাশেই যে এক জন মালী গাছের আড়ালে ব'সে ফুলের কেয়ারী নিড়াচ্ছিল, তা মহেশ লক্ষ্য ক'রে দেখে নি। সে বাগানের মধ্যে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোদালের বাঁটের নিদারুণ আঘাত খেয়ে যুগোপায়ে

তাই ক'রেই পালিয়ে আসতে হলো। সে পালিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগল, গাছে অতগুলো জবা ফুল ফুটে রয়েছে, ওর মাত্র একটা পেলেই তার গর্দভরূপ ঘুচে মনুষ্যরূপ হতে পারে, কিন্তু ঐ সামান্য বস্তুটিও তার কপালগুণে এত দুর্লভ হয়ে উঠল।

সেই রাত্রে মহেশ যে খোঁয়াড়ে আটক ছিল, তারই পাশে মানুষের চাপা গলার ফিসফিস শব্দ শুনে চমকে গেল। সে তার লম্বা লম্বা কান দুটো খাড়া ক'রে শুনতে লাগল, কে কি কথা বলছে। সে একটু মনোযোগ দিয়েই বুঝতে পারলে, একটা স্বর হচ্ছে তারই পালক ধোপার মেয়ে পাঁচীর, আর অপর স্বরটা হচ্ছে পাঁচীদেরই পড়শী শীতল ধোপার। তাদের কথা শুনে মহেশ জানতে পারলে, শীতল পাঁচীকে ভালবাসে, আর পাঁচীও শীতলকে ভালবাসে, কিন্তু পাঁচীর বাবা পাঁচীর সঙ্গে এক বুড়ো বাহাত্তুরে ধোপার বিয়ের সম্বন্ধ করেছে। তাই আজ তারা দুজনে গোপনে মিলিত হয়ে কলকাতায় পালিয়ে যাবে স্থির করেছে।

তাদের কথা আর আগ্রহ শুনে মহেশের রোমাঞ্চ হলো। ধোপার ঘরেও রোমান্স, ধোপা-ধুপিনীর প্রাণেও কবিত্ব! মহেশের ডাক ছেড়ে একবার বাহবা দেবার প্রবল বাসনা হলো, কিন্তু তার [illegible] সকল সময় যে রকম অনর্থপাত হয়, তাতে সে তার রসনাকে দমন ক'রে ফেললে। সে শুনলে, পাঁচী বলছে—এটা যদি গাধা না হয়ে ঘোড়া হতো, তা হ'লে আমরা ওর পিঠে চেপে রাতারাতি কতদূরে পালিয়ে যেতে পারতাম।

শীতল বললে,—"তা না হোক ঘোড়া, ওকে নিয়েই আমাদের

[চা]লাতে হবে, পথে আমাদের মোটঘাটরী বইবে। কখনো তুমি ওঁকে [পে]লে তোমাকেও পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর ওটার যেমন বুদ্ধি [আ]ছে, কল্‌কাতায় ওকে দেখিয়ে দু' পয়সা রোজগারও করতে পারব।"

শীতল এসে মহেশের খোঁয়াড়ের আগড় খুলে দিতেই সে গিয়ে শীতলের পাশে দাঁড়াল এবং তার পিঠে বোচকা চাপিয়ে দেওয়া মাত্র সে শীতল আর পাঁচীর পিছনে পিছনে চল্‌ল।

শীতল আর পাঁচী মহেশকে নিয়ে কল্‌কাতায় পালিয়ে এসেছে। তারা মহেশকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় খেলা দেখিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে!

এক দিন এক জন লোক মহেশের বুদ্ধির দৌড় দেখে শীতলের কাছ থেকে মহেশকে কিন্‌তে চাইলে। শীতল প্রথমে মহেশকে হাত-ছাড়া করতে চাইলে না। কিন্তু সেই লোকটি যখন ক্রমে ক্রমে ৫০০৲ টাকা দাম চড়ালে, তখন শীতল আর পাঁচী আর লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। পাঁচী শীতলকে পরামর্শ দিলে,—"একটা গাধার দাম ৫০০৲ টাকা পাচ্ছ, আর কি চাও? তার পর জন্তু-জানোয়ারের অসুখ আছে বিসুখ আছে, আর যদি ম'রে গেল তো মূলেই হাবাত। তাই বলি, এ দাঁও ফস্কাতে দিও না। যা পাচ্ছ ঢের পাচ্ছ মনে ক'রে ওকে ছেড়ে দাও।"

শীতল পাঁচীর পরামর্শ সমীচীন বিবেচনা ক'রে মহেশকে বেচে ফেল্‌লে, কিন্তু চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তেই একটা গাধাকে তারা বিদায় দিলে।

যে লোকটি মহেশকে কিনলে, সে এক জন সার্কাসের লোক। সে স্থির করলে, মহেশকে কিছু বুদ্ধির কৌশল শিখিয়ে বেশ দু পয়সা রোজগার ক'রে নেবে। সে মহেশকে বাড়ীতে এনে তাকে অঙ্ক কষতে, নাম লেখা কাগজ চিনে বাহির করতে, বইয়ের পাতা উলটে একটা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় কোনো লেখা বাহির ক'রে দিতে শেখাবার চেষ্টায় মন দিলে। কিন্তু সে মহেশের অশিক্ষিতপটুত্ব আর অগর্দভোচিত বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে মহেশকে যা যা করতে বলে, মহেশ অমনি চটপট সেই কাজ ক'রে তাকে তাক লাগিয়ে দেয়। মহেশ স্কুলে যা কিছু শিখেছিল, এখন তার গাধারূপে সেই অল্প বিদ্যার পরিচয় দিয়েই সে বাহবা পেতে লাগল। সে ভাবতে লাগল, হায় রে মানুষ, যে বুদ্ধি ও বিদ্যা নিয়ে সে মনুষ্যরূপে গর্দভ আখ্যা অর্জন করেছিল, এখন তার চেয়ে ঢের কম বুদ্ধি-বিদ্যার পরিচয় দেবার অবসর পেয়েও সে সকলের কাছে পরম সমাদর ও বাহবা লাভ করছে। মহেশ গাধা চেহারায় যতদূর সম্ভব বুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে তার নূতন মনিবকে খুশী করতে চেষ্টা করতে লাগল। কারণ, সে ঠিক বুঝেছিল যে, সে যে পরিমাণে বুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় জানাতে পারবে, সেই পরিমাণে সে আদর-যত্ন পাবে এবং যত দিন সে মানুষ হওয়ার সুযোগ না পাচ্ছে, তত দিন তাকে এমনি ক'রেই গাধাজন্মের যথাসম্ভব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আদায় ক'রে নিতে হবে।

বাস্তবিক হলোও তাই। মহেশের জন্য পশুযোগ্য ঘাসজলের বরাদ্দ তো হলোই, তা ছাড়া রোজ কিছু ভুষি, ভাতের ফেন, তরকারির

ওঁচলা ব্যবস্থা হলো আর মাঝে মাঝে ছোলাভিজা আর জিলাপি-কচুরী দেবারও ব্যবস্থা হলো। বহু কাল পরে মহেশ একটু মুখ বদ্‌লে বাঁচ্‌ল। গাধা হওয়া ইস্তক সে ঘাস-জল ছাড়া আর কিছু খেয়ে মুখ বদ্‌লাবার অবকাশ পায়নি। এখন তার গাধাজন্মের রাজার হাল হলো।

সার্কাসওয়ালার পসার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। গাধা হেন নির্বুদ্ধি পশুর বুদ্ধির দৌড় দেখ্‌বার জন্যে তার সার্কাসে লোকে লোকারণ্য হতে লাগ্‌ল।

কল্‌কাতায় কিছু দিন খেলা দেখবার পরে সার্কাসওয়ালা পশ্চিমে গেল। হাজিপুর গাজিপুর বেড়িয়ে সে মহেশকে নিয়ে কাশীতে গিয়ে হাজির হলো। অল্পদিনের মধ্যেই মহেশের সুখ্যাতি কাশীর মহারাজের কর্ণগোচর হলো। সার্কাসওয়ালার ডাক পড়্‌ল মহারাজকে গাধার বুদ্ধির খেলা দেখাতে হবে।

মহারাজ তখন রামনগরের প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। সার্কাস-ওয়ালা মহেশকে নিয়ে রামনগরে গেল।

রামনগরের অপর নাম ব্যাসকাশী। ব্যাসকাশীতে মর্‌লে মানুষ নাকি পরজন্মে গাধা হয়। মহেশের মহা দুর্ভাবনা হলো যে, এ জন্ম তো গাধা হয়ে কাটতে চলেছে। এর পরের জন্মটাও কি গাধা হয়েই কাটাতে হবে? যদি কোনো দুর্ঘটনায় এখানে তার মৃত্যু হয়, তবেই তো সর্বনাশ!

মহেশ মহারাজকে তার বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বেশ মোটা রকমের বক্‌শিশ আদায় ক'রে কাশীতে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। কিন্তু

সে এবার সঙ্কল্প করলে যে, যেমন ক'রেই হোক সে মানুষ হবে; আর গাধা হয়ে সে থাকবে না।

এক দিন তার সুযোগও জুটে গেল। তার সহিস দুর্গাবাড়ী থেকে একছড়া জবাফুলের মালা এনে তার আস্তাবলের দেয়ালের গায়ে একটা হুকে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছিল। মহেশ অপেক্ষা ক'রে রইল, রাত্রে যখন সে আস্তাবলে একলা হবে তখন কোনো রকমে সেই জবার মালায় গা ঠেকিয়ে গাধাজন্ম থেকে অব্যাহতি পাবে। সে আগ্রহে আর ঔৎসুক্যে সে রাত্রে ভালো ক'রে খেতে পারল না।

রাত্রে যখন সে একাকী আস্তাবলে বন্ধ হলো, সে সতৃষ্ণ-নয়নে জবাফুলের মালাগাছটির প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কেমন ক'রে সেই মালার নাগাল সে পেতে পারে। সে অনেক লাফালাফি দাপাদাপি ক'রেও কিছুতেই নাগাল পেলো না। তার দাপাদাপি আর লাফালাফির শব্দ শুনে সহিস ছুটে এলো। মহেশ তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে, সে চাট ছুড়ে চীৎকার ক'রে একটা মহামারি ব্যাপার ক'রে তুলল এবং বারবার হুকে টাঙানো জবার মালাটার দিকে চেয়ে তাকে নাগাল পাওয়ার জন্য লাফাতে লাগল। সহিসের প্রবল ইচ্ছা হলো, বেশ ক'রে দু ঘা লাঠি লাগিয়ে দিয়ে মহেশের আস্ফালন থামিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সময় মহেশের মনিব এসে পড়াতে মহেশ সে যাত্রা বেঁচে গেল। মহেশের মনিব মহেশকে খুবই ভালবাসত। মহেশ জবার মালা দেখে বারবার লাফালাফি করছে দেখে সে মালাগাছি পেড়ে মহেশের মুখের

কাছে বস্লে। সে মনে করেছিল যে. মহেশ জবাফুল খাবার জন্যে অমন অধীর হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে দেখে আশ্চর্য্য হলো যে, মহেশ মালাটা খেতে চেষ্টা না ক'রে ধীরে ধীরে মাথা নত ক'রে মালার গায়ে মাথা ঠেকাতে চেষ্টা করছে। সার্কাসওয়ালা মনে কর্লে যে, বুদ্ধিমান গাধা মালাগাছিকে দেবতার নির্মাল্য জেনে ভক্তি দেখাবার জন্ত অত অধীর হয়েছিল। কিন্তু সার্কাসওয়ালার আর সহিসের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল—যখন তারা দেখলে যে, গাধার মাথায় মালা ঠেক্বামাত্র গাধা হয়ে গেল একটা মানুষ। তারা বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হয়ে মহেশের কাছ ছেড়ে দিল দৌড়। তারা আরো অনেক লোকজন ডেকে ডেকে যখন ফিরে এলো, তখন অবাক্ হয়ে দেখলে, সেখানে না আছে গাধা আর না আছে কোনো লোক। তারা পালিয়ে যেতেই মহেশ দিব্য সুযোগ পেয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে লোকের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল, তাকে কেউ আর চিন্তেই পার্লে না যে, সে-ই গাধা থেকে মানুষ হয়েছে।

মহেশ গাধা থেকে মানুষ হয়েই বাড়ী ফির্বে ব'লে সটান ষ্টেশনে এসে ট্রেনে চ'ড়ে বস্ল। সে যখন সার্কাসে খেলা দেখাত, তখনই সে কতকগুলা টাকা রোজ লুকিয়ে এনে এনে একটা জায়গায় জমা ক'রে রেখেছিল। আজ সেই পুঁজিতে সে বাড়ী রওনা হ'তে পার্ল।

মহেশ বাড়ীতে ফিরে এসেছে। তার যখন ঘুম ভাঙ্ল, তখন সে দেখলে, সে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে।

মহেশ আমাদের দৌরাত্ম্যে ও পণ্ডিত মশায়ের বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের স্কুল ছেড়ে দিয়ে তার মামার বাড়ীতেই চ'লে গেল। তার পর মহেশের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয় নি। অনেক দিন পরে শুনলাম, সে নাকি ঠিকাদারী কাজ ক'রে লক্ষপতি হয়েছে। তাকে মা সরস্বতী দয়া করেন নি ব'লে মা লক্ষ্মী তার উপর অজস্র করুণা বর্ষণ করেছেন।

আমরা সবাই চাকরী বা ব্যবসায় ক'রে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করি, আমাদের সংসারে খাওয়া-পরার লোকের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বেড়ে চলেছে। কিন্তু শুনতে পাই, মহেশের অত টাকা ব'লেই তার সংসারে কেউ নেই। সে বিয়ে করে নি ; আর নাকি তিন কুলেও কেউ নেই ; অত টাকা যে কে খাবে, তার ঠিক নেই। অত টাকা সে করবে কি ?

আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। ছেলের বাপ মেয়ের বাপের পয়সায় জীবনের সকল অভাব আর সকল সাধ মিটিয়ে নেবার দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হ'য়ে ব'সে আছেন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখছি। এমন সময় আমার নামে একখানা ইন্‌সিওর চিঠি এসে উপস্থিত হলো। হাতের লেখা অপরিচিত, চিঠির উপরে পোষ্টাপিসের ছাপ দেখে জানলাম, চিঠি আসছে দার্জিলিঙ থেকে। হাজার টাকার ইন্‌সিওর। দার্জিলিঙে আমার এমন কে বন্ধু আছে যে, আমায় এমন দুঃসময়ে থোক হাজার টাকা আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত ও মুহ্যমান হয়ে খামের উপর প্রেরকের নাম পড়লাম—মহেশচন্দ্র পালিত।

মহেশ! আমাদের সহপাঠী মহেশ! আমাদের অশেষ বিদ্রূপভাজন মহেশ! আমার অসময়ের বন্ধু সেই?

আমি তাড়াতাড়ি পত্র খুলে পড়লাম, মহেশ লিখছে—

"প্রিয় দিব্যেন্দু,

আমাদের পুরাতন সহপাঠী বন্ধু অমরনাথ দার্জিলিঙে বেড়াতে এসেছে, আমিও কার্য্য উপলক্ষ্যে এখানে কিছুদিন থেকে আছি। হঠাৎ সে দিন ম্যালে অমরনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে স্যানিটেরিয়মে আছে। তাকে আমাদের বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে কথায় কথায় আমাকে জানালে, তুমি তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যে নাকি বড় বিব্রত হয়ে পড়েছ। একটি পছন্দসই পাত্র পেয়েছে, কিন্তু ছেলের বাপের খাঁইয়ের জন্যে সে পাত্রটি হাতছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আচ্ছা দিব্যেন্দু তোমার এই হতভাগ্য বন্ধুকে কি একবারও মনে করতে নেই? আমি যে তোমাদের নাম-দেওয়া গাধার মতন খেটে খেটে টাকা রোজগার করছি, তা কার জন্যে বলো তো? আমার তো আত্মীয় বলতে তোমরাই। আমার খরচ কি বলো তো? ঘি দুধ পেস্তা বাদাম পোষ্টাই খাদ্য খাওয়ার আমার কিছু প্রয়োজন আছে বলতে পারো? আজকাল আমার ওজন দু-মণ সতেরো সের। আর বপু বাড়াবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? তবে এই টাকার বোঝা কি শুধু গাধার

বোবা হয়েই থাকবে? তোমার মেয়ে আমার স্নেহপাত্রী, তার বিবাহে আমার এই সামান্য যৌতুক দিয়ে তাকে আশীর্বাদ কোরো।

আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কারো যদি টাকার বিশেষ আটক থাকে, তবে আমাকে স্মরণ করতে বোলো। আমার ব্যাঙ্কের চেক-বই তাদেরই সেবার নিবেদিত ক'রে রেখেছি।

দেশে অভাব অনটনের সীমা নেই। কিন্তু যে-সব লোককে আমি কস্মিন্‌কালেরও দেখি নি, জানি নি, তাদের জন্তে আমার কোনো রকম দরদ বোধ হয় না। আমি হাঁসপাতাল করা, ধর্মশালা করা, বিদ্যালয়ে দান করা প্রভৃতি পছন্দ করি না। কার জন্তে ঐ সব? যাদের চিনি না, তাদের জন্তে তো? আমি অত্যন্ত সংসারসক্ত স্বার্থপর বিষয়ী লোক, আমি আপনার লোকছাড়া আর কারো কথা ভাব্‌তেই পারি না। যাঁরা বুদ্ধদেব অথবা যীশুখৃষ্টের মতন বিশ্বপ্রেমিক, তাঁরা করুন হাঁসপাতাল আর ধর্মশালা। আমি আমার আপনার লোকদের নিয়েই সন্তুষ্ট।

তোমার মেয়ের বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার সংবাদ পেলে সুখী হবো। নিমন্ত্রণ করতে ভুলো না ভাই। যদি পারি, তোমার মেয়ের শুভবিবাহে উপস্থিত থাকব, আর তখন তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে।

তোমাদের বন্ধু—শ্যামল মহিম
ওরফে শ্রীমহেশচন্দ্র পালিত।"

অবাক্ করলে মহেশ! আমাদের বন্ধু। আমরা তার আপনার লোক! সে আমাদের যেচে সাহায্য করে। ছি ছি। মানুষের কেবলমাত্র

বাহিরটা দেখে বিচার করলে কি ভুলটাই করা হয়! ঐ কুৎসিত বিকট চেহারাটার মধ্যে যে এমন একটা উদার প্রাণ গোপন ছিল, তা কেউ কোনো দিন সন্দেহও করে নি। আমরা মহেশের সদাশয়তায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়্‌লাম।

মহেশ আমার মেয়ের বিবাহে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। বয়স হয়ে সে যেন আরও মোটা আর কালো হয়েছে দেখলাম। আমি তাকে বললাম—"আচ্ছা ভাই মহেশ,—"

মহেশ আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে—"মহেশ কি? তোমাদের কাছে আমি এখনও সেই মহিষই থাকৃতে চাই। আমি তোমাদের কাছ থেকে স্থানের ব্যবধানে দূরে প'ড়ে গেছি, তাই ব'লে আমাকে তোমাদের মন থেকেও দূরে ঠেলে রেখো না।"

আমি তার অমায়িকতা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লাম—"আচ্ছা ভাই মহিষ, তুমি বিয়ে করো নি কেন?"

মহেশ হেসে বল্‌লে—"কেন যে করি নি তা আমার নামেই তো তোমরা বুঝ্‌তে পারো। মহিষকে বিয়ে করতে পছন্দ কর্‌তে পারে, এমন মেয়ে ভূ-ভারতে কোথাও আছে কি? আমার টাকা দিয়ে অনেক মেয়ে কিন্‌তে মিল্‌ত জানি, অনেক মেয়ের বাবা মেয়ে খেতে পর্‌তে কষ্ট পাবে না ব'লে আমাকে মেয়ে গছাতে ঢের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তোমরা-আমার বন্ধুরা আমার প্রতি প্রীতির পক্ষপাত বশতঃ আমাকে যতখানি নীরেট গাধা ঠাউরে রেখেছ, বাস্তবিক পক্ষে আমি ততখানি

গাধা নই। আমি জানি যে, আমাকে কোনো মেয়ে কস্মিন্‌কালে পছন্দ করতে পারে না। আমার আয়না তো আর একটুও খোসামোদ করতে জানে না যে, সে আমাকে ধারণা করিয়ে দেবে যে, আমি কন্দর্পেরই বিরাট্‌ রাজ-সংস্করণ। কাজেই আমি কেবলমাত্র টাকায় কেনা সেবাদাসী সংগ্রহ করতে চাই নি। সে রকম নীচ আর হীন প্রবৃত্তি আমার হয় নি। কাজেই বিয়েও হয় নি। আর আমি তো একে ভয়ানক স্বার্থপর আছি-ই, তার উপর আবার বিয়ে ক'রে নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আরো সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর হয়ে সংসারে জড়িয়ে পড়্‌তাম। তার চেয়ে এ বেশ আছি নির্ঝঞ্ঝাট।"

মহেশের এ-কথার পর আর কিছু বল্‌বার কথা খুঁজে পেলাম না। মহেশ একটু হেসে অন্যপ্রসঙ্গ তুলে তার বিয়ের আলোচনা চাপা দিয়ে দিলে।

এর অল্পদিন পরেই শুন্‌লাম, আমাদের স্কুলের প্রসন্ন পণ্ডিত মশায় তাঁর নাৎনীর বিয়ে দেওয়ার জন্য বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তিনি আমার কাছে কিছু সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। আমি কন্যাদায় যে কাকে বলে, তা বিলক্ষণ জেনেছিলাম, তাই আমার সাধ্যাতীত সাহায্য আমি তাঁকে করলাম, আর পরামর্শ দিলাম—মহেশকে চিঠি লিখে জানাতে। পণ্ডিত মশায় সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন—"জানো তো দিব্যেন্দু, মহেশ আমার উপর কী রকম চটা ছিল! সে কি আমাকে কিছু সাহায্য করবে?"

আমি তাঁকে ভরসা দিয়ে বল্‌লাম, "আমাকে সে যে-চিঠি লিখে যে-রকম দরাজ হাতে সাহায্য করেছিল, তার পর তাকে আর সন্দেহ করা চলে না। আমরা তো তার পিছনে লাগ্‌তে কসুর করিনি। আমাদের তুলনায় আপনি আর কি করেছেন? আর যা তিরস্কার করে-ছিলেন, তা তার ভালোর জন্যেই। অতএব আপনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করবেন না। আপনি মহেশকে চিঠি লিখ্‌লেই আপনার সকল দুর্ভাবনা মিটে যাবে।"

পণ্ডিত মশায় মহেশকে পত্র লিখ্‌লেন। উত্তর এলো না। আমি পত্র লিখ্‌লাম—পণ্ডিত মশায়কে সাহায্য করতে অনুরোধ ক'রে। আমার পত্রের উত্তর এলো, কিন্তু তাতে পণ্ডিত মশায়ের কোনো উল্লেখও নেই, যেন তাকে পণ্ডিত মশায়ের প্রসঙ্গে কিছুই লেখা হয় নি। পণ্ডিত মশায় রেজেষ্টারী ক'রে জবাবী মাশুল দিয়ে পত্র লিখ্‌লেন। তার এক-নলেজ্‌মেণ্ট বা প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ ফিরে এলো, তাতে মহেশের সই করা, কিন্তু অনেক দিন অপেক্ষা করার পরও তার কোনো উত্তর এলো না।

তখন আমি পণ্ডিত মশায়কে পরামর্শ দিলাম যে, আপনি নিজে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হোন, আপনি সামনে থাকলে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

পণ্ডিত মশায় সন্দেহাকুল হয়ে কিছুতেই মহেশের কাছে নিজে যেতে সম্মত হচ্ছিলেন না। তিনি বলছিলেন যে,—"না বাবা, আমি যাব না,

শেষে কি যাচ্ঞা করার অপমানের উপর প্রত্যাখ্যানের অপমান পেয়ে ফিরে আস্‌ব?”

কিন্তু আমি তাঁকে এক রকম জোর ক'রেই মহেশের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সম্প্রতি মহেশের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে মহেশের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে সে কখনও প্রার্থীকে বিমুখ ক'রে ফেরত দিতে পারবে না।

পণ্ডিত মশাই মহেশের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহেশ তাঁকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, একটু বস্‌তে পর্যন্ত বল্‌ল না। পণ্ডিত মশায় মহেশের বৈঠকখানায় ঢুকেই বুঝলেন যে, মহেশ তাঁকে দেখেই অপ্রসন্ন হয়েছে, সে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। তাই তিনি মহেশের ঘরে প্রবেশ ক'রে তাকে কোনো রকম সম্ভাষণ না ক'রেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন এই প্রতীক্ষায় যে, যা হোক কোনো কথা মহেশ আগে বলুক, তার পর তিনি কোনো কথা বল্‌বেন কি না তা বিচার ক'রে দেখবেন। পণ্ডিত মশায় প্রায় মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, তিনি ঘর থেকে পালাতে পার্‌লে বাঁচেন। তিনি কেমন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যা'বেন ভাব্‌ছেন, এমন সময় সেই ঘরের সাম্‌নে দিয়ে একজন চাকরকে চ'লে যেতে দেখে পণ্ডিত মশায় তাকে উদ্দেশ ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—“ওহে বাপু, তোমাদের বাবু কোথায় বল্‌তে পারো?”

ভৃত্যটি অবাক্ হয়ে পণ্ডিত মশায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে,

লোকটা কাণা না কি? কাণা ব্যতীত অন্য লোকের চোখে বাবুর অত বড় চেহারাটা কি আর পড়্‌ত না?

তখন শীতকাল, পৌষের মাঝামাঝি। মহেশ একখানি লাল রঙের শাল গায়ে জড়িয়ে ব'সে ছিল। পণ্ডিত মশায়ের অসঙ্গত প্রশ্ন শুনে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"আমাকে চিন্‌তে পারছেন না পণ্ডিত মশায়, আমিই সেই আপনার গাধাস্য মহেশ।"

পণ্ডিত মশায় তাঁর প্রতি মহেশের অনাদরের গ্লানি রসিকতা দিয়ে চাপা দেবার জন্য বল্‌লেন—"ও! ওখানে তুমি ব'সে আছ বাবা মহেশ; আমি মনে করেছিলাম, একটা প্রকাণ্ড বড় কুঁচ কে চেয়ারে রেখে দিয়েছে।"

মহেশ একেই পণ্ডিত মশায়ের উপর চ'টে ছিল, তার উপর আবার তার কালো রং আর লাল শালের সঙ্গে লাল কুঁচের তুলনা ক'রে ব্যঙ্গ করাতে তার পিত্ত আরো জ্ব'লে গেল। সে রুষ্ট স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—"আপনি আমাকে বলেন গাধা, আর আপনার নিজের ঘটে এটুকু বুদ্ধি জোগাল না, যে, আমি আপনার অতগুলো পত্রের উত্তর দিচ্ছি না দেখেও বুঝতে পারেন না যে, আমার কাছ থেকে আপনার কোনো রকম প্রত্যাশা করা বৃথা? আপনি আমাকে বরাবর যে রকম লাঞ্ছনা আর অপমান করেছেন, তাতে আমার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করাই নির্বুদ্ধিতা!"

পণ্ডিত মশায় ম্লান-মুখে হাস্‌তে চেষ্টা ক'রে বল্‌লেন—"না বাবা মহেশ, আমি কিছু সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তোমার দ্বারে আসে নি।

মাতা মে চ সরস্বতী প্রতিদিনং লক্ষ্ম্যা বিমাত্রা সহ
যৌধর্ষং বিদধাতি সাপি চপলা রুষ্টা গৃহান্নির্গতা।
তাম্ অন্বেষয়তা ময়াত্র ভবতো দ্বারি প্রবিষ্টং মুদা
মন্যে ত্বদ্ বচসাত্র নাগতবতী স্থানান্তরং গম্যতে॥

মাতা মোর সরস্বতী, নিত্য লক্ষ্মী বিমাতার সহ
করে কথা কাটাকাটি, তাই নিয়ে দারুণ কলহ।
কোপনা চঞ্চলা লক্ষ্মী রুষ্টা হয়ে গৃহ তেয়াগিয়া
কোথায় গেলেন চ'লে, তাই তাঁরে ফিরি যে খুঁজিয়া।
কোথায় দুয়ারে আসা বিমাতা সে লক্ষ্মীর সন্ধানে,
'বুঝিনু তোমার বাক্যে হেথা নাই, যাই অন্যখানে॥"

পণ্ডিতমশায় তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে যাচ্ছেন দেখে মহেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল এবং পণ্ডিতমশায়ের পিছনে পিছনে দ্রুতপদে তাঁর নাগাল ধর্‌বার জন্য যেতে যেতে তাঁকে ডেকে বল্‌লে,—"আচ্ছা পণ্ডিত মশায়, আপনার কোন্ নাতনীর বিয়ে?"

পণ্ডিত মশায় ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন,—"আমার তো একটিমাত্র সন্তান, তারই মেয়ে।"

মহেশ ব'লে উঠল—"কি! তবে কি সে খেঁদীর মেয়ে?"

পণ্ডিত মশায় বল্‌লেন,—"হ্যাঁ বাবা, সে আমার একমাত্র কন্যা খেঁদীরই মেয়ে। ঐ মেয়েটিকে গর্ভে ধারণ করেই সে বিধবা হয়। তাই তাঁর নিতান্ত আকিঞ্চন যে, একটি সৎপাত্রে তার আদরের মেয়েকে সম্প্রদান করা হয়। দিব্যেন্দু আমাকে পীড়াপীড়ি ক'রে তোমাকে পত্র লেখালে, আর সেই আমাকে তোমার কাছে অপমান হওয়ার জন্য জেদ ক'রে পাঠাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমি তার কথা উপেক্ষা করে আসব না-ই স্থির ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু খেঁদী যখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমাকে অনুরোধ করলে যে, তুমি একবার মহেশ-বাবুর কাছে গিয়ে দেখই না, তুমি কাছে গেলে তিনি তোমাকে কিছুতে নিরাশ করতে পারবে না, তখন আর আমার সঙ্কল্প টিক্‌ল না। বিধবা হতভাগা মেয়েটার একমাত্র সম্বল ঐ মেয়েটার বিবাহ দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিনি, এই কথা তাদের কারো মনে কোনো দিন না ওঠে, এই ভেবে আমি এই লঘুতা স্বীকার করতে সম্মত হয়েছিলাম। এখন খেঁদীকে গিয়ে বল্‌তে পারব যে, আমি তার মেয়ের জন্য কোনো অপমান স্বীকার করতেই আর বাকি রাখিনি।"

মহেশ মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বল্‌লে, "পণ্ডিত মশায়, খেঁদী আপনাকে আমার কাছে আস্‌তে বলেছিল ?—আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ীতে যদি পায়ের ধূলো দিলেন, তবে আপনাকে আমি অমনি শুধু হাতে ফিরে যেতে দেবো না। আর আপনাকে যা কিছু বল্‌লাম, তার জন্যে কিছু মনে করবেন না। সে কেবল আমার মনের

অভিমানের ক্ষোভ মাত্র মনে ক'রে আমাকে আপনি মার্জনা করবেন। আপনি ঘরে ফিরে আসুন।"

মহেশ পণ্ডিত মশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে তখনি একখানা চেক লিখে দিলে একেবারে পাঁচ হাজার টাকার!

পণ্ডিত মশায় একেবারে হতাশ হওয়ার পর আশাতীত দান পেয়ে প্রসন্নচিত্তে মহেশকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাকে তাঁর নাৎনীর বিবাহে উপস্থিত থাকবার জন্য বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রে বিদায় নিলেন।

বিবাহের সময় মহেশ পণ্ডিত মশায়ের নাৎনীর সমস্ত অলঙ্কার গড়িয়ে তার গোমস্তাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, আর বিয়ের পর বরকনেকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অনেক উপহার দিয়ে আদর-যত্ন করেছিল। সে পণ্ডিত মশায়ের নাৎজামাইকে নিজের ঠিকাদারী কাজের শূন্য বখরাদার ক'রে নিয়ে তাকে নিজের কাছে কাছে রাখে, পণ্ডিত মশায়ের নাৎনীটিকে সে নিজের মেয়ের মত ভালোবাসে। কিন্তু পণ্ডিত মশায় ও তার নাৎনী নাতজামাই বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধ ক'রেও মহেশকে কখনো পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীতে নিতে পারে নি। একবার পণ্ডিত মশায়ের নাৎনীর অসুখ হওয়াতে তার মা খেঁদী জামাইবাড়ীতে আসছে শুনেই মহেশ সমস্ত কাজকর্ম ফেলে রেখে কাশ্মীর ভ্রমণ করতে চ'লে গিয়েছিল এবং খেঁদী তার জামাইবাড়ী থেকে চ'লে গেছে খবর পেয়ে তবে সে বাংলা দেশে ফিরে এসেছিল।

মহেশ পণ্ডিত মশায়কে মাসহারা দেয়। আর পত্রের নীচে স্বাক্ষর করে—"আপনার গর্দভাস্ত"।

পণ্ডিত মশায় মহেশকে আদর ক'রে লিখেছিলেন—"তুমি আমার সুবর্ণ-গর্দভ। হিব্রুদের যেমন ছিল গোল্‌ডেন কাফ, তুমি আমার তেমনি সুবর্ণ-গর্দভ।"

মহেশ রসিকতা ক'রে লিখেছিল—"আপনি আমার প্রশংসা ক'রে আমার অহঙ্কার বাড়িয়ে তুল্‌তে যতই চেষ্টা করুন না কেন, আমার দর্পণ আমার দর্প নিত্য চূর্ণ ক'রে জানিয়ে দেয় যে, আমি গর্দভ হলেও হতে পারি, কিন্তু আমি সু-বর্ণ কিছুতেই নই, আর সুবর্ণের স্তূপের মধ্যে ডুবে থাক্‌লেও আমার বর্ণ কখনো সু হবার নয়। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি!"

প্রলয়ের পরে

দু'দিন আগে যাহার নাম ছিল ম্যাসিয়া পল দুপোঁ, তাহার পরে যাহার নাম হইয়াছিল নাগরিক দুপোঁ এবং এখন যাহার নাম হইয়াছে কেবলমাত্র দুপোঁ সেই লোকটি এইমাত্র তাহার বিছানা হইতে গড়াগড়ি দিয়া উঠিল। আজকে তাহার বিশ্রামের দিন। এই লোকটির উপাধি দর্শনাচার্য, সে ফিলজফির ডক্টর, সে নিজের সৌভাগ্যের জন্য বিশেষ গর্বিত, কারণ সে এখন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার এক জন ঝাড়ুদার। সে অতি সামান্যই মাইনে পায়, তাও তাহাকে দেয় কাগজের টাকা, যাঁহার দাম দিনকের দিন কমিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু দেশের সকলের দশাই সমান, সকলেই এক নৌকার যাত্রী, তবু ত সে সরকারী চাকরী করে বলিয়া রুটীর টিকিট, মাংসের টিকিট, কয়লার টিকিট এবং একটা বাসা রাখিয়া তাহাকে ভাড়াটিয়া রাখিবার লাইসেন্স পাইয়াছে। ইহার দ্বারা ত সে কতকটা মাতব্বরী করিতে পারে। তাহার আগেকার ছোট বাসাটির মধ্যে এখন যদিও সে কেবল তাহার শয়নঘরটি আর পোষাকী

ঘরটি মাত্র রাখিবার হুকুম পাইয়াছে এবং এখনকার নূতন আইনের জন্য তাহাকে তাহার বাসার জন্য ঘরগুলো তাহার আগেকার চাকরাণীকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, সেই ঘরগুলিতে সেই দাসীটা তাহার স্বামী ও দু'টি সন্তান লইয়া থাকে।

কিন্তু দুপোঁ এই ব্যবস্থায় বিশেষ ক্ষুণ্ণ নয়। সেই স্ত্রীলোকটি তাহার রান্না করে, আর তাহার পোষাক রিপু করিয়া দেয়। তাহার ভাগ্য ভালো। সেই মেয়েলোকটি তাহাকে শীতকালে তাহাদের রান্নাঘরে উনানের ধারে বসিয়া আগুন পোহাইতে দেয়। অবশ্য যদি দুপোঁ নিজের বসিবার পিড়ি লইয়া যায়। সে কোনও একটা বাগান হইতে একটা ভাঙ্গা বেঞ্চের টুকরা ঐজন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে।

রাতের বাসি কোনও খাবার যাহা থাকে, তাহাতে দুপোঁ পরম আগ্রহভরে লোভীর মতন কামড় লাগায়। সে তাহার পিতামহের আমলের একখানা অতি পুরাতন ক্ষুর দিয়া নিজের দাড়ি কামায় এবং সাবানের খরচ বাচায়—সাবানের খরচ বাঁচাইতে গিয়া তাহার গালের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না, সমস্ত দিন জ্বালা করিতে থাকে। সে একটা সার্ট গায়ে দেয়। ইহা তাহার পরম গর্বের বস্তু, কারণ, অনেক লোকেরই ঐ জিনিষটা নাই। কিন্তু তাহার পাজামার নীচে পরিবার ড্রয়ারও নাই, মোজাও নাই। তাহার কোটটা অতি খেলো রকমের ফ্লানেলের তৈরি এবং তাহা তাহার গায়ে ঠিক মানানসই হয়ও না, কারণ, সে সেটাকে পঁ-ন্যফ নয়া পুলের উপর হইতে একটা ছোরা দেখাইয়া সংগ্রহ

করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু তাহার পাজামাটা বেশ মজবুত মোটা দামী কাপড়ের। এ-ছাড়া শীতকালের জন্য তাহার একটা উৎকৃষ্ট আলষ্টার কোট আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার জুতা-জোড়া ছিঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এইটাই এখন তাহার প্রধান ভাবনার বিষয় হইয়াছে।

পোষাক পরিবার সময় সে জানালার কাছে যায়—জানালার সাসিতে আবছায়া দেখিয়া পোষাক ঠিক করে, আয়নার বালাই তো ঘরে নাই। জানালার দুটো সাসি ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার জায়গায় দুই টুকরা হল্‌দে পেষ্ট্‌বোর্ড্‌ লাগাইয়া লইয়াছে। জানালার কোনও পর্দাও নাই, তাহা কাটিয়া সে তোয়ালে-গামছা করিয়াছিল।

রাস্তায় জনস্রোত কোলাহল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। জ্বালানি কাঠ-বোঝাই গাধার পাল ঠেলাগাড়ী টানিয়া চলমান মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়া পথ করিয়া চলিতেছে। বুড়া আর বুড়ীরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে-বোঝাই ঠেলাগাড়ী ঠেলিয়া চলিতেছে। দরদস্তুর, চেঁচামেচি, হাসি, গালাগালি, আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ। এ এক অদ্ভুত রকমের গোলমাল—মানুষের আর পশুর চীৎকারের খিচুড়ি। এ-গোলমালের সঙ্গে আগের রাস্তার গোলমালের নিতান্তই গরমিল—আগে ছিল কলের ঘড়ঘড়ানি, মোটরগাড়ীর ভেঁপুর আওয়াজ, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ ব্রেক কষার আর্তনাদ ; এ-সব দুপৌ তাহার স্মৃতির অন্তস্তল হইতে তল্লাস করিয়া তবে মনে করিতে পারে।

বন-জ্যোৎস্না

জল্‌দী। চটপট। সময় নাই। সে তাহার আগেকার বাথরুমের দিকে একবার করুণ-কাতর দৃষ্টিতে চাহিল। সে সেখানে আর স্নান করে না। কলে আর জল পড়ে না। স্নান করিতে হইলে তাহাকে নীচের আস্তাবল হইতে জল ধরিয়া বহিয়া আনিতে হয়। জলের ভারীরা সব একজোট হইয়া মজুরী বাড়াইয়া দিয়াছে। এক গামলা জলের উপর ঝুঁকিয়া জলের ছায়াতে মুখ দেখিয়া পাঁচ মিনিটে সে কামানো সারিয়া লইল। তাহার পরে সে চারিদিকে চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিল—আজ কি বেচিয়া তাহার ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারবে। তাহার আগেকার বইগুলির মধ্যে আর কয়খানাই বা বাকী আছে! আর বই কিনিবার লোকই বা কৈ? বই ভালোবাসে, এমন লোকও তো দেখা যায় না। আচ্ছা, ঐ এলার্ম্‌ বাজা ঘড়ীটা কি বলে? হাঁ এটাতে কাজ চলিতে পারে। ইহা আর এখন তাহার কি কাজে লাগিবে? তাহার চেয়ে একজোড়া জুতার দরকার ঢের বেশী। তাহা ছাড়া একটা কাটা-কাচের বাটি আছে, সেটা তো কেহ তরকারি রাখিতে লইতে পারে। আর একটা বড় পর্দা আছে আড়াই গজ চওড়া আর পাঁচ গজ লম্বা। তাহা দিয়া ত একটা চমৎকার রাজযোগ্য পোশাক হইতে পারিবে। বাহবা! সে ঐ পর্দাটা তাহার জানা এক জন পাতি দর্জির দোকানে লইয়া যাইবে। আর বাকী জিনিসগুলা সে বাজারে গিয়া বিক্রয় করিয়া তাহাদের পরিবর্তে তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিতে পারিবে।

২

সিঁড়িটা ময়লা নোংরা হইয়া আছে। কিন্তু এখন কেই বা তাহা লক্ষ্য করে? সিঁড়িতে পাতা কার্পেট পোশাকে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কার্পেট আট্‌কাইয়া রাখিবার তামার শিকগুলিও অন্তর্ধান করিয়াছে। উঠা-নামা করিবার লিফ্‌ট্‌ কলটাও আর চলে না, লিফ্‌টের খাঁচার মধ্যে এখন একজন মজুর তাহার স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করে। ইহা তাহাদের মন্দ লাগে না। একদল গৃহহীন মেয়ে পুরুষ নীচের *গারাজ্‌টায় জটলা পাকাইয়া আস্তানা গাড়িয়াছে। ইহারা আগে যে-সব বাড়ীতে থাকিত, তাহা পুড়িয়া গিয়াছে। ইহারা সকলে যেন একটা দল পাকাইয়া একজনকে তাহাদের সর্দার মনোনীত করিয়াছে, সেই সর্দারই সকলের হইয়া এখন মিউনিসিপ্যালিটীর সঙ্গে ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিতেছে। সেই সময়ে তাহারা সকলে আগুনের চারিদিকে ঘিরিয়া কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলী করিয়া বসিয়া ছিল। ঘর হইতে পচা মাছ-মাংসের দুর্গন্ধ বাহির হইয়া আসিতেছিল। ঘরটা ধোঁয়ায়

ধূমাকীর্ণ অন্ধকার হইয়া ছিল এবং দেয়াল হইতে তাহাদের চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল।

স্যাঁ জার্মাঁ বুল্‌ভার তরুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন প্রশস্ত পথ। তাহাতে সর্বত্র লোকের ভিড়, পদব্রজী পথিকরা তাহা একেবারে দখল করিয়া জুড়িয়া আছে। কদাচিৎ একটা দুটা বাস বা পথচারী গাড়ী চলিতেছিল। মোটর-কার নাই বলিলেই হয়, ঘোড়ার গাড়ীই বেশী। পথিকরা এখন নির্ভয়ে পথ পার হইয়া চলাফেরা করিতেছে। পথের পাশে পাশে ফুটপাথ একবারে ঢাকিয়া ফেলিয়া দোকানের সারি বসিয়াছে এবং তাহারা খুব জোর ব্যবসা ও বেচাকেনা চালাইয়াছে—তাহারা হরেক রকমের জিনিস বেচিতেছে—কাগজ, সাবান, সূচ, সুতা, খবরের কাগজ, ফল। তাহারা চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া হাতে তুলিয়া খরিদ্দারদের দেখাইয়া দেখাইয়া যে যে বস্তু বিক্রয় করিতেছিল, তাহার মধ্যে দড়িতে হালি-গাঁথা পেঁয়াজের বা দশটা গুটি সূতার মালাই অধিক।

রু দ্য সেইন্‌ রাস্তা দিয়া দুপোঁ তাহার দর্জির দোকানে গিয়া দেখিল, সে কাঁদিতেছে। তাহার দোকানের সব কাপড়-চোপড় সরকারে তলব করিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছে এবং তাহার দোকানে একটা সমবায় দোকান খুলিবারও কথা চলিতেছে। দুপোঁ আর সেখানে অপেক্ষা করিল না। সে তাহার পর্দাটাকে লুকাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল এবং সে নদীর ধারের বাঁধা জেটির উপর দিয়া চলিতে লাগিল। সেখানেও লোকে নানা দ্রব্য বিক্রয় করিতেছিল এবং যদিও দোকানদাররা এখনও তাহাদের

সাইনবোর্ডে পুস্তক-বিক্রেতা বলিয়া ঘোষণা করিতেছিল, তথাপি তাহারা কেবল পুস্তকই বিক্রয় করিতেছিল না। তাহাদের দোকানে পেঁয়াজ, মূলা, শিম, কাপড়, বাসন, কম্বল, ছুরী এবং জুতাও ছিল, এবং দোকান-গুলি পথের এক ধার জুড়িয়া দেয়াল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া ছিল। এইসব বিবিধ দ্রব্যের দোকান প্লাস্ দ্য লা কঁকর্দ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল।

গেয়ার দ্যু'ওর্সে রেল-ষ্টেশনের সাম্নে একটা গোটা ব্যাটালিয়ান সৈন্য সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং একজন ছুঁচালো দাড়িওয়ালা লোক তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত চীৎকার করিয়া হুকুম করিতেছিল। দ্যুপোঁ জানিতে পারিল—তাহারা শার্ৎর্ মহল্লার দিকে দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করিতে যাত্রা করিতেছে।

এক জন সার্জেন্ট দ্যুপোঁকে বলিল—সব সময়ে এই কাজ সহজে সম্পন্ন হয় না। ভার্সেই পর্যন্ত সব বেশ ভালো। কিন্তু যেই তুমি শার্ৎর্ গিয়া পৌঁছিলে, তখন যদি সেখানকার চাষাদের বুঝাইয়া রাজী করিতে না পার, তবে তাহাদের ক্ষেত খামার গোলা মরাই পুড়াইয়া দিয়াও কোনও লাভ নাই, তাহারা কিছুতেই কিছু ছাড়িয়া দিবে না। এইসব চাষারা এমন বোকা মূর্খ স্বার্থপর যে, তাহারা সর্বসাধারনের সুবিধার কথা কিছুই বুঝে না।

পালে-বুর্বোঁ অট্টালিকার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে দ্যুপোঁর মনে পড়িল তাহার এক বন্ধুর কথা, সে উত্তরদেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া কয়েক শত পলাতক লোকের সঙ্গে এই পরিত্যক্ত শাসন-পরিষদের

প্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছে। এক একটি পরিবার পূর্বের অফিস্‌ঘর-গুলিতে অথবা অন্যান্য স্বতন্ত্র ঘরগুলিতে বাস করিতেছে। আর যাহারা অবিবাহিত, তাহারা এক একটা দল বাঁধিয়া হলের মেঝেতে অথবা অর্ধ-গোলাকার সভাগৃহের গ্যালারীর মধ্যে বাসা করিয়াছে। ইহারা মোটের উপর পাঁচ ছয় শত হইবে। প্রত্যেক তিন জন সভাসদের আসন দখল করিয়া শয্যার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। সভাসদদের ডেস্কগুলি উহাদের ভাঁড়ার হইয়াছে এবং বেঞ্চিগুলি হইয়াছে উহাদের খাট। দুপোঁ দেখিল, হলঘরের চারিদিকে সুটকেস্, পোঁটলা-পাঁটলি, আর তেলমাখা খবরের কাগজ ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। এক-একটা আগুনের খাপরা ঘিরিয়া মণ্ডলী করিয়া এক-একদল লোক আহার করিতেছিল, পান করিতেছিল, তাস খেলিতেছিল, তর্ক করিতেছিল। সর্বত্র একটা এলোমেলোর মেলা। সকলেই বেশ প্রসন্ন ছিল না, তাহারা বাতাসের অভাব লইয়া খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল। তাহাদের দুঃখ ভুলিবার জন্য তাহারা একটা থিয়েটারের দল গঠন করিয়া লইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে সভাগৃহে তাহারা থিয়েটার অভিনয় করিত। দুপোঁর বন্ধু বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার জায়গায় তাহার কুকুরটা ছিল, সে দুপোঁকে দেখিয়া গোঁ গোঁ করিতে করিতে দাঁত খিঁচাইতে লাগিল।

৩

প্লাস্ দ্য কঁকর্দ্ জুড়িয়া অনেকগুলো গাড়ী ফৌজের মতন সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেগুলো এক একটা দোকানের কাজ করিতেছিল—সবগুলিতে ফল-মূল তরি-তরকারি বোঝাই করা ছিল, আর লোকে সেইগুলির ফাঁকে ফাঁকে বেড়াইয়া বেড়াইয়া খরিদ করিতেছিল এবং হাট-বাজারে যেমন একটা কলরোল শোনা যায়, তেমনই হট্টগোল করিতেছিল। দ্রুপোঁ খুঁৎখুঁৎ করিতে করিতে চক পার হইয়া চলিয়া গেল। তাহার তো সব্জী-বাজারে কোনও দরকার নাই ; শাঁজ-এলিজে এখন জ্যান্ত পশু-পক্ষীর বাজারে পরিণত হইয়াছে, সেখানেও তাহার কোনও আবশ্যক নাই। হাঁস মুরগী প্রভৃতি পাখী এবং খরগোশ বিক্রয় হইতেছিল, কারণ, এখন প্যারিসের অনেক লোক খরগোশ পালন ও উৎপাদন করিতেছিল, তাহাদের খাবারের অভাব ছিল না, বোয়া দ্য বুলোঞ্-এর জঙ্গল এখন পরিষ্কার করিয়া এবং কুর-লা-রেইন্ জুড়িয়া নানা শাক-সবজী চাষ হইতেছিল, তাহারা মূলার শাক ইত্যাদি খাওয়াইয়া

খরগোশ পালন করিতেছিল। মোটাসোটা পোষা ইঁদুর বাজারে খুব বেশী বিক্রয় হইতেছিল এবং তাহার সঙ্গে খুব বেশী মস্‌লা দেওয়া ইঁদুরের লাপ্‌সি সকলেই সমাদর করিয়া কিনিতেছিল, উহা খাইতে বড়ই সুস্বাদু।

লুভ্‌র্‌ এবং লুক্‌সেম্‌বুর্গের বাগান, মন্‌ৎসো পার্ক্‌, এমন কি প্যারিসের সকল পার্ক্‌ ও স্কোয়্যার চাষের ক্ষেতে পরিণত করিয়া তাহাতে শাক-সব্জী উৎপাদন করা হইতেছিল। প্রাসাদে প্রাসাদে অফিস খোলা হইয়াছিল, ক্রিয়ো হোটেলে, মীর বহরের অফিসে, মিউজিয়ামে,—সরকারী চিত্তাকর্ষক কোনও জিনিস আর বড় ছিল না। হতভাগা পলাতকরা জোর-জবরদস্তি করিয়া সব অফিস বেদখল করিয়া লইয়াছে এবং তাহাতে গোটা গোটা পরিবার, এক একটা দল আস্তানা গাড়িয়া জমাইয়া বসিয়াছে। প্রত্যেক সপ্তাহে তাহাদিগকে বাহির করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, আবার তাহারা জানালা গলিয়া আসিয়া দখল করিয়া বসিতেছে। প্যারিসে এমন একটি সরকারী বাড়ী ছিল না, যেখানে কিছু না কিছু পলাতককে আশ্রয় দিতে বাধ্য হইতে না হইয়াছে। আকাশ হইতে বোম-বৃষ্টিতে, বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধে ও অন্তর্বিদ্রোহে, আগুন লাগিয়া রাজধানীর অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অনেক রাস্তার উপর বাড়ী ভাঙিয়া পড়িয়া রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কালো বা ভাঙাচোরা বাড়ীর কঙ্কাল চারিদিকে এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লুভ্‌র্‌ প্রাসাদের

ভিতর বৃষ্টির জল পড়িতেছে। বিজয়তোরণ আর্ক্ দ্য ত্রিয়ঁক স্খলিত হইয়া একটি পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়াছে। অপেরা থিয়েটার-বাড়ীর সম্মুখভাগ আগুন লাগিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে, এখন তাহার নগ্ন-দেহের ভিতর দিয়া তাহার লোহার পঞ্জর দেখা যাইতেছে, তাহার অভ্যন্তর এখন কালো, ধ্বংস হইয়া আছে, এখানে সেখানে অল্প অল্প ঘাস গজাইয়াছে, আর রাত্রে তাহার মধ্যে মাতালদের টলটলায়মান ছায়ার নৃত্য দেখা যায় এবং সেই ভগ্ন সঙ্গীতমন্দিরে মাতালদের চাঁদ দেখিয়া চীৎকার ধ্বনিত হইয়া থাকে।

প্লাস্ দ্য লা মাদ্‌লীন্ এখন কাপড়ের বাজারে পরিণত হইয়াছে। দুপোঁ তাহার কাঁধের উপর তাহার পর্দাটা ফেলিয়া সেই বাজারে গিয়া পৌঁছিল এবং এদিক ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে সে সকল দ্রব্যের উপরই চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইতেছিল যে, সে কোন্ জিনিসের বদলে তাহার পর্দাটাকে বিক্রয় করিতে পারে। তাহার কাটা কাচের বাটিটা ও এলার্ম্ ঘড়িটা বড় একটা কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিল না: কিন্তু পর্দাখানা বহুলোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। লোকে ইহা হাত দিয়া নাড়িয়া ইহার মর্যাদা পরখ করিয়া দেখিতেছিল। তাহারা দরদস্তুর করিতেছিল। দুপোঁ তাহার জিনিসগুলিকে ধরিয়া রাখিতেছিল, সে সহজে সস্তায় বিক্রয় করিবে না।

সে বলিল—এর দাম দশ লক্ষ টাকা। আমি এক ছালা আলুর বদলে ইহা হস্তান্তর করিব না।

প্রথমে তাহাকে একগাড়ী পেঁয়াজ দাম দিবার প্রস্তাব হইল। সে তাহা লইতে অস্বীকার করিল। তাহার পরে দু'টা ছাগল। সে রাজী হইল না। ঝাড়া চার ঘণ্টা দরদাম করার পরে যে তাহার এলার্ম্ ঘড়িটা একখানা চৌদ্দ ফলার সুইস ছুরীর বদলে বিক্রয় করিল এবং তাহার পর্দাখানা, যাহাতে পুরা দুইটা পোশাক হইতে পারিবে বলিয়া সে প্রচার করিতেছিল, ছোট একছালা আলু ও ছোট একছালা চালের বদলে সে বিক্রয় করিল এবং ফাউ লইল এক জোড়া বেশ ভালো শিকারী বুট জুতা, যাহা ঝাড়া দুই বৎসর তাহার পায়ে দেওয়া স্বচ্ছন্দে চলিবে।

সে একটা গাধার ভারের বোঝা পিঠে লইয়া চলিল। সে প্রথমেই তাহার নূতন বুট-জুতা-জোড়া পায়ে দিয়া লইল, যেন কেহ তাহা চুরি করিয়া লইতে না পারে। পুরাতন জুতাজোড়া দড়ি বাঁধিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া লইল। সে তাহার খাদ্যসামগ্রীগুলি তাহার এক বন্ধুর জিম্মায় রাখিয়া দিল এবং তাহার হতভাগা কাচের বাটিটা লইয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লেখার পারিশ্রমিক যাহা বাকী পড়িয়াছিল, তাহা আদায় করিতে চলিল। এই পণ্ডিতটি কেবলমাত্র রাস্তা ঝাঁট দিয়াই তুষ্ট থাকিত না। সন্ধ্যাকালে তাহার কাজ হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া সে খবরের কাগজের জন্য গল্প লিখিত। এখন, তাহার দুইটি গল্পের জন্য সে হাজার ফ্রাঁ নোটে মোট কুড়ি লক্ষ ফ্রাঁ পারিশ্রমিক পাইল।

সে ঐ টাকা পাইয়া বলিয়া উঠিল—এর চেয়ে বিনা পারিশ্রমিকে

লেখাও ভালো! এই কাগজের স্তূপ লইয়া আমি কি করিব বলুন তো!

খাজাঞ্চী কেবল হাত তুলিয়া হতাশার ভঙ্গী করিল। সে ইহার কি প্রতীকার করিতেই বা পারে! কিন্তু তাহার স্ত্রী একটা ঝোলের বাটি চাহিয়াছিল, তাই সে এক বোতল কালীর বদলে দুপোঁর কাচের বাটিটা কিনিতে স্বীকার করিল।

দুপোঁ একটা সরকারী রেস্টোরাঁতে গিয়া বৈকালী আহার করিল। যদিও সর্বত্র কাগজের টাকা সচল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তথাপি কোনও দোকানই সেই কাগজের টাকা লইয়া তাহাকে খাবার দিতে স্বীকার করিল না।

৪

রেষ্টোরাঁতে খাইতে বসিয়া সে তাহার পাশের এক লোকের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইল। সেই লোকটির বিড়ালের মতন তীক্ষ্ণ চোখ দুপোঁর দৃষ্টি এড়াইয়া গেল। সেই লোকটি তাহার চিবুকটা দুপোঁর হাতের খবরের কাগজের দিকে বাড়াইয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—দুনিয়ার হালচাল কি?

দুপোঁ বলিতে আরম্ভ করিল—কে জানে? প্রথমতঃ, দুনিয়াই বা কাহাকে বলে? শোনা যায় তো এখানে বিবাদ বাধিয়াছে, আর সেখানে যুদ্ধ লাগিয়াছে। আক্রমণ, সংগ্রাম,—এ বলে ঐ জায়গা আমার, আর সে বলে আমার। চমৎকার! নয় কি?

লোকটি দুপোঁকে জিজ্ঞাসা করিল—কালকে কি তুমি ভোট দিতে যাইতেছ?

"হাসাইলে দেখিতেছি! আমি দিব ভোট? কেন? আমার কেবল একটামাত্র ভাবনা যে, কালকে আমরা কিছু খাইতে পাইব কি না।" দুপোঁ তাহার চোখ তুলিয়া সেই লোকটির দিকে চাহিল

এবং হাসিতে লাগিল। কিন্তু সেই লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, লোকটা নিশ্চয় এক জন স্পাই গোয়েন্দা। সে কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিল যে, তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইতেছে।

সে তাহার চিবুক রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বলিল—ভাবিয়া দেখিলাম, আমি কাল ভোট দিব। হ্যাঁ, দিব বৈ কি। ঐ যে দেশ লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে, সে দেশ তো আমাদেরই, কি বলো বন্ধু ?

'হ্যাঁ।'—সেই লোকটা দুপোঁর ছুরীর দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল—"খাসা ছুরীখানি তো তোমার বন্ধু ! তোফা !"

দুপোঁ তাড়াতাড়ি বলিল—তুমি এটা চাও ? নেবে ? আমার এই রকম ছুরী দুখানা আছে। একখানা তুমি নাও। যে দিন-কাল পড়েছে, তাতে আমাদের পরস্পরের পরস্পরকে সাহায্য করাই তো উচিত।

আপ্যায়িত হইলাম—বলিয়া সেই লোকটা ছুরীখানা লইয়াই প্রস্থান করিল।

দুপোঁ ভাবিল—বড় ভাগ্যে বাঁচিয়া গিয়াছি। প্রাণ বাঁচাইতে এ আর বেশী কি মূল্য দিলাম। আমার মাথায় যা আসিয়াছিল, আমি তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। ঐ বদমায়েসটা আমাকে নিশ্চয় গেরেপ্তার করাইয়া দিতে পারিত। ভাগ্যে সে ঘুষখোর হইয়াছিল !

সে শিশ্‌ দিয়া খান্‌সামাকে ডাকিল। খান্‌সামা পা টানিয়া টানিয়া আসিয়া খাবারের দাম চাহিল দশ লক্ষ টাকা।

দুপোঁ তাহার দাম চুকাইয়া দিল এবং তাহাকে বখ্‌শিশ দিল এক লক্ষ টাকা। এত টাকা বখ্‌শিশ দিয়াও দুপোঁ খান্‌সামার কাছে একটু ধন্যবাদও পাইল না।

সে তখন পথে বাহির হইয়া পড়িল। সমস্ত রাস্তাই বেমেরামত হইয়া রহিয়াছে। রাস্তার কাঠের পাটাতন উঠিয়া গিয়াছে, আল্‌কাৎরার প্রলেপ ফাটিয়া চটিয়া পথে গর্ত হইয়াছে। একটা দুটা বাস্‌ চলিতেছে। ভাড়াটিয়া গাড়ী চলিতেছে মন্দ নয়। রেলগাড়ীর অনেক ষ্টেশন এখন পলাতক লোকদের আস্তানা হইয়াছে, সেগুলি এখন গ্রামে পরিণত হইয়াছে। অনেক বাড়ী বেমেরামত হইয়া পড়িয়াছে। বুল্‌ভার্‌ দেজ্‌ ইতালিয়ঁা রাস্তায় দুইটা বাড়ী নূতন তৈয়ারি হইতেছিল, এখন তাহা অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া পোড়ো বাড়ী হইয়া আছে, আর রাজ্যের হতভাগা লোক সেখানে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। হাবরে লোকেরা সেই পোড়ো বাড়ীর সব ঘরে আস্তানা পাতিয়াছে,—কোকিল যেমন অন্য পাখীর বাসা দখল করিয়া বসে। জ্বালানি কাঠ করিবার জন্য দরজা, জানালা, মেঝের পাটাতন, আস্‌বাব সব খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। দুপোঁ এই রকম ছন্নছাড়া অবস্থা দেখিতে দেখিতে অসাড় হইয়া গিয়াছে, সে মূঢ়ের মতন অচঞ্চলভাবে এই দুর্দশার দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কোনও কোনও বাড়ী যেন কেল্লার মতন করিয়া আটঘাট বাঁধিয়া আড়াল দিয়া রাখা হইয়াছে। কোনও কোনও জায়গায় গোটা পথটাই বেড়া ও বাধা রচনা করিয়া ঘেরা হইয়াছে; কোনও কোনও জায়গায় একটা

পাড়াকে পাড়া বেড় দিয়া স্থানীয় সরকারী আক্রমণের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাস্তার ড্রেন সর্বদা অপরিষ্কার হইয়া আছে, আর তাহাতে যাহা কিছু পড়িয়া পচিয়াছে, তাহার দুর্গন্ধে সমস্ত বাতাস ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড অস্থায়ী আস্থানার মধ্যে চোর আর খুনীরাই রাজত্ব করিতেছে।

প্যারিসে এখন আর বড় কারখানা নাই। বড় কারখানা সব ভাঙিয়া ছোট ছোট হইয়া গিয়াছে, এক এক জন কারিগর কতকগুলি মজুর লইয়া কাজ চালাইতেছে। আগের চেয়ে এখন জীবনের প্রয়োজন অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর কাহারও বড় ভুঁড়ি দেখা যায় না। সকলের মুখেই একটা কঠিন উদগ্র ব্যগ্রতার ভাব ফুটিয়া আছে—যেন সব হিংস্র পশু শিকারের জন্য ওত পাতিয়া রহিয়াছে। ছেলে-মেয়েরা পথে পথে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, কারণ, সব স্কুলের বাড়ীই লোকের বাসের জন্য দখল করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহারা দল বাঁধিয়া ফিরিতেছে, আর চমৎকার চুরি করিয়া প্রচুর সামগ্রী সংগ্রহ করিতেছে।

৫

দশ লক্ষ টাকার নোটের বোঝা বগলদাবা করিয়া দুপোঁ ইতস্ততঃ করিতেছিল যে, সে সিনেমাতেই যাইবে অথবা ক্লাবে যাইবে। সে ক্লাবের বিরুদ্ধেই রায় দিল, কারণ, পলিটিক্স আলোচনা তাহার যথেষ্টই হইয়াছে। থিয়েটারে যে-সব বই অভিনয় করা হইতেছে, তাহাও তাহার কাছে অত্যন্ত রূপক ও বিষাদময় বলিয়া বোধ হয়। সে সিনেমা হইতেও হতাশ হইয়া বাহিরে আসিল। একটা কাফেতে গিয়া অল্প একটু পান করিয়া এক হাত তাস খেলিয়া লইল। যখন সে উত্তরপাড়ার ষ্টেশনের কাছে আসিল, তখন সে একটা গোলমাল শুনিল। একটা ছেলে একটা ময়লা কাপড়ে জড়াইয়া একটা কিছু বগলদাবা করিয়া লইয়া তাহার কাছ দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছিল। দুপোঁ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। এক টুক্‌রা কয়লা পথের উপর পড়িয়া গেল। দুপোঁ বলিয়া উঠিল—কয়লা!

ছেলেটা ন্নুপোঁর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গা মোড়া দিয়া ছটফট করিতেছিল। ন্নুপোঁ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া ষ্টেশনের দিকে দৌড়িল। ষ্টেশন এক রকম শূন্য, কেবল দুইটা হতভাগ্য এঞ্জিন হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। ষ্টেশনের এক টেরে শেষের দিকে অনেক-গুলা লোক এক জায়গায় জুটিয়া ছুটাপুটি করিতে করিতে গোলমাল করিতেছিল এবং সেই চীৎকার মাঝে মাঝে খুব প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কত লোক ন্নুপোঁর পাশ দিয়া দৌড়িয়া আগাইয়া চলিয়া গেল, যদিও ন্নুপোঁও তাহার দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া যত দ্রুত পারে দৌড়াইতেছিল। যাহাদের বয়স তাহার চেয়ে অল্প, তাহারা তাহাকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে নিজের সমবয়সী লোকদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়াই দৌড়াইতেছিল, যদিও তাহাকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছিল। রেল-লাইনের ধারে একটা প্রকাণ্ড স্তূপ করিয়া কয়লা ঢালা আছে। এক ঘণ্টা আগে একটা ট্রেন আসিয়াছিল এবং ঐ জায়গায় কয়লা খালাস করিয়া ঢালিয়া দিয়া গেছে। ন্নুপোঁ পিছন দিকে মুখ ঘুরাইয়া দেখিল, তাহার পিছনে এক মহা জনতা ছুটিয়া আসিতেছে, আর ইহার মধ্যে কতকগুলা পুলিশের লোকও আসিয়া হাজির হইয়াছে। সে একেবারে মরিয়া হইয়া আগে লাফাইয়া গেল, ধাক্কা দিয়া দুজন মেয়েলোককে উন্টাইয়া ফেলিয়া দিল এবং নিজের মাথাতেও বেশ চোট খাইল; কিন্তু সে আর কোনও দিকে ফিরিয়া তাকাইল না। সে এক লহমার মধ্যে আপনার গায়ের জামাটা খুলিয়া

পাতিয়া তাহাতে কয়লা ভর্তি করিয়া লইল এবং তাহার পরই তাহা লইয়া পলায়ন করিল। সে খুব সময়ে পলাইয়াছিল। তাহার পরেই পুলিশ আসিয়া সারবন্দি হইয়া দাঁড়াইল। ডুপোঁ তাহার কয়লার মোট পেটের তলায় চাপিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল এবং তাহার মাথার উপর দিয়া বন্দুকের গুলি-বর্ষণের আওয়াজ ছুটিয়া গেল। জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পলাইতে লাগিল, কেবল দু'তিন জন লোক মরিয়া সেখানে পড়িয়া রহিল। একটা লোক তাহার পাছায় আহত হইয়া যন্ত্রণায় কাতরাইতে কাতরাইতে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া পলাইতেছিল, কিন্তু সে তখনও তাহার কয়লার বোঝা ছাড়ে নাই। সে ডুপোঁর পাশ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইল। ডুপোঁ তাহার চালের বস্তা আনিতে গেল। সে তাহার বন্ধুকে এক টুপি কয়লা উপহার দিয়া হাঁটিয়া বাড়ীতে চলিল। হোটেল দ্য ভিল্ পার হইয়া যাইবার সময়ে সে দেখিল, সেই চক লোকে লোকারণ্য। অস্ত্রধারী লোকেরা সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেই দিনই সকালে যে সৈন্যদের ডুপোঁ দেখিয়াছিল, ইহারা তাহারাই, ডুপোঁ দেখিয়াই চিনিতে পারিল। তাহাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত, ক্লান্ত এবং ধূলি-কর্দমে মলিন; লোকে তাহাদের ঘিরিয়া তাহাদের যুদ্ধযাত্রার বিবরণ সংগ্রহ করিতেছিল।

অবশেষে একটা সৈনিক রুক্ষস্বরে বলিল—কিছুই করা গেল না।

চাষারা একেবারে অবুঝ, কিছুতেই তাহারা তাহাদের গোঁ ছাড়িল না। তাহারা আর কিছুতেই ফসল বুনিবে না। তাহাদের অর্ধেক জমী অনাবাদী হইয়া পড়িয়া আছে আর অর্ধেকে যে ফসল হয়, তাহা তাহারা নিজেদের জন্য রাখিয়া দেয়। যদি তাড়াতাড়ি আগে যাওয়া যায়, তবে গম তখনও ঝাড়াই হয় নাই অথবা গম ভালো করিয়া পাকেই নাই। আর যদি বিলম্ব করিয়া যাওয়া যায়, তবে ক্ষেত্রে এক কণাও পড়িয়া নাই, সব উধাও হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা একটু বিলম্বেই গিয়া পৌছিয়াছিলাম! গম কাটা হইয়া গিয়াছে, মাড়া হইয়াছে, গোলাজাত করা হইয়াছে, ভগবান্ জানেন কোথায়। শার্ৎর্ হইতে দশ মাইল দূরের এক গ্রামের চাষারা তো আমাদের উপর গুলিই চালাইল।

হোটেল দ্য ভিল্ হইতে একটা বিষম চীৎকার-শব্দ শোনা গেল। বাহিরের জনতা দরজায় ঘা মারিতে লাগিল। অবশেষে এক পাল্লা কপাট ভাঙিয়া পড়িল। ডুপোঁ এত শত কৌতুহলাক্রান্ত লোকদের সঙ্গে মিশিয়া যখন হলের মধ্যে গিয়া পৌছিল, তখনই বক্তৃতা শেষ হইয়া গেল। প্যারিস এলাকার বিদ্রোহী বিচার-সভার কাঠগড়ায় সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার তাহার সেনানীর উর্দি পরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ডুপোঁ সেই কম্যাণ্ডারের ছোট ছুঁচালো দাড়িটি দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল।

প্রেসিডেণ্ট বলিল—জবাব দাও হাঁ কি না। তুমি বলিয়াছিলে কি না যে, তুমি গম সংগ্রহ করিয়া আনিবে?

সেই সেনানীটি কোনও উত্তর দিল না।

—তুমি গম পাইয়াছিলে ?

লোকটি কেবল তাহার কাঁধ কাঁপাইল।

প্রেসিডেন্ট্ বলিয়া উঠিল—একে গেরেপ্তার করো। বিদ্রোহী আদালত ইহার বিচার করিবে।

সেই সেনানীটি হঠাৎ ক্রোধে মৃগীরোগীর ন্যায় বিহ্বল হইয়া অপমান-কর কথা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল। সমবেত জনতা তাহাকে বিশ্বাসঘাতক ও চোর বলিয়া গালি দিতে দিতে পাহারাওয়ালাদের বাধা অতিক্রম করিয়া সেই ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। চারিদিক্ হইতে সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়া বন্দুকের কুঁদা দিয়া জনতাকে মারিতে লাগিল। দুপোঁ আধছ্যাঁচা হইয়া ঘর হইতে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল। সে জানিতে পারিল না যে, সেই বোকা সেনানীটি সেইখানেই প্রাণ খোয়াইল কি না।

চকের মধ্যে সৈন্যবল তাহাদের বন্দুকগুলি একত্র ঠেকাঠেকি করিয়া খাড়া করিয়া রাখিয়া তাহার চারিদিক্ ঘিরিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল আর তামাক খাইতেছিল। তাহাদিগকে ঘিরিয়া জনতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সকলে অকারণে অনাবশ্যক চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিল। দুপোঁ সেখান হইতে প্রস্থান করিল, কারণ, তাহার এই ব্যাপার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার এখন প্রধান চিন্তা এমন কোনও একটা সদাব্রত দানসত্রে গিয়া ভাল করিয়া আহার করিতে

হইবে—যেখানে বিনা পয়সায় মদ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। তাহাকে আসিতে দেখিয়াই সদাব্রতের কর্তাটি চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিন্তু যেই দেখিল যে, দুপোঁ দুই পোঁটলা চাল ও কয়লা লইয়া আসিতেছে, অমনই সে দুপোঁকে একটি খোলা জানালার ধারে একটি ভালো জায়গায় লইয়া গিয়া বসাইল। খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া দুপোঁ খাবারের দাম বলিয়া কাগজের নোট দিতে উদ্যত হইল। সত্রওয়ালা দুপোঁর চালের বস্তার দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল। অবশেষে তাহাদের মধ্যে রফা হইল—দুই পালি চাল। ইহা দুপোঁর কাছে অত্যন্ত দুর্মূল্য বলিয়া মনে হইল, যদিও সে পেট ভরিয়া খাইয়া এক বোতল মদও পান করিয়াছে এবং তাহার এই অসাধারণ বিলাসিতা দেখিয়া তাহার কাছের এক জন লোক তাহাকে মহা সম্ভ্রমের সহিত জমীদারের ন্যায় খাতির করিয়াছে এবং অপর এক জন লোক তাহাকে পাঁড় মাতাল মনে করিয়াছে।

খাইবার সময়ে দুপোঁ ভোজনসুখে চোখ বুজিয়া তাহার বিগত যৌবন-কালের সুখের দিনের কত কথাই ভাবিতেছিল এবং কল্পনা করিতেছিল, সে যেন তাহার সেই অতীত দিনের ভোজন-টেবিলে বসিয়া খাইতেছে। এই বিরাট্ বিপ্লবের সময় হইতে কত সঙ্গীই না মারা গেল। তাহার সব বন্ধু। তাহার একটি সন্তান ছিল, কিন্তু সে তাহার দিদিমা দাদামহা-শয়ের কাছে গ্রামে গিয়া আছে। সে যদি তাহাদিগকে একবার দেখিতে যাইতে পারিত। কিছুদিন আগে সে একটা মেয়েলোককে লইয়া ঘরকরণা পাতিয়াছিল, সে লোকও মন্দ ছিল না, কিন্তু এক দিন সে

তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বাঃ! জীবনের আসল পদার্থ হইতেছে সুস্থ ও সবল থাকা। সেই সর্বনাশা গ্যাস-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে মানুষে যে ভয়ঙ্কর জীবন যাপন করিতেছে, তাহাতে যাহারা দুর্বল, তাহারা এই সংঘাত সহ্য করিতে পারিতেছে না। কিন্তু সে ইহা কাটাইয়া উঠিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার পকেটে যতক্ষণ রিবলভারটি আছে ততক্ষণ সে নিজেকে বেশ শক্ত সমর্থই মনে করিতে পারে এবং সে জীবনের চরম দুর্গতিও কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। সে যাইবার সময়ে তাহার অর্দ্ধভুক্ত রুটীখানা উঠাইয়া লইয়া চলিল, কোনও ভিখারীকে দেখিলে দান করিবে। পথে দু'জন ভিক্ষুক আসিয়া জুটিল। সে রুটীখানা দু'ভাগ করিয়া দান করিল। আরও দু'জন যখন আসিল, তখন সে তাহাদিগকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিল।

দুর্পোঁ তাহার এই কীর্তিতে স্ফূর্তি পাইয়া পথ হাঁটিতে লাগিল! নৎরদাম পার হইবার সময়ে সে এখানে সেখানে ক্ষীণ বাতির আলোকে খচিত অন্ধকারের ভিতর হইতে ভজন-গানের সুর শুনিতে পাইল। সে মনে মনে ভাবিল—জগৎটা একেবারে বদল হইয়া যায় নাই। সেই সমানই জীবনসংগ্রাম, এখন কেবল একটু বেশী তীব্র। সেই ভিক্ষুক, এখন কেবল সংখ্যায় কিছু বেশী; সেই ধার্মিক, এখন কেবল পরস্পরকে বিনাশ করিতে একটু অধিক আগ্রহান্বিত।

তাহার নিজের বেলা সে অজ্ঞেয়বাদীই থাকিয়া গিয়াছে। সে পরপীড়ন পছন্দ করে না। এখন উৎপীড়ন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

যখন স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিল, তখন নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। এক নৎরদাম গির্জাতেই তিনটি ধর্ম আশ্রয় লইয়াছে—রোম্যান ক্যাথলিক, ফ্রান্সের স্বকীয় ধর্মমত, আর নূতন ধর্মমত, যাহাতে কোনও রকমে প্রতিমাপূজা স্বীকৃত হয় না—একেবারে অপৌত্তলিক ধর্ম। প্রত্যেক ধর্মের জন্য একই গির্জার মধ্যে আলাদা আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু তাহারা তিন দলে বেশ শান্তিতেই একত্র আছে, কেহ কাহারও গলা কাটাকাটি করে না।

৬

রাত্রি হইয়া আসিতেছিল। রাস্তার আলো জ্বালা হয় না। তরুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন বুলভার শীঘ্রই কালির মত কালো হইয়া গেল এবং বিজন হইয়া পড়িল। যখন দুপোঁ তাহার বাসার রাস্তার মোড়ে একটা ভাঙা ল্যাম্পের তলায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন তিন জন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা তাহাকে বলিল—আপনি আমাদের লইয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন, কেবল আমাদের আপনি আপনার সঙ্গে লইয়া গিয়া আশ্রয় দিন।

তাহারা দু'জন বোন, আর এক জন তাহাদের সখী। দুপোঁ রূঢ়ভাবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রস্তাব অস্বীকার করিল। সে যেখানে থাকে, সেখানে ত' সে একটা নবাবী অন্দরমহল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। তাহারা জেদ করিতে লাগিল, কারণ, তাহারা মনে করিয়াছিল, এই লোকটির কাছে প্রচুর আহারের সঞ্চয় আছে। দুপোঁ তিন জনকেই লইতে অস্বীকার করিল, কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহার চুলগুলি খুব কালো, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার মনের মধ্যে কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। অপর দু'জন তাহাদের পিছনে পিছনে ক্ষুধার্ত কুকুরের মত অনুসরণ করিতে লাগিল। দুপোঁ আর সেই কৃষ্ণকেশী বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন একটা পোড়ো বাড়ীর উঠানে গিয়া প্রবেশ করিল।

তাহার পরে হুপো খুব ঘটা করিয়া পকেট হইতে কাগজের নোট বাহির করিয়া সেই কৃশকায়া রমণীটিকে দান করিতে উদ্যত হইল—এই লও এক লক্ষ টাকা। ইহার পরে তোমার আর কোনও ওজর আপত্তি থাকিতে পারে না।

কিন্তু সেই রমণী হুপোর নোটের তাড়া তাহার মুখের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ঐ পচা টাকা তোমার ট্যাকেই রাখিয়া দাও। ঐ ছাই কাগজের রাশি লইয়া আমি কি করিব বলিতে পার ?

সেই মেয়েটি কাঁদিয়া ফেলিল। সে অবশেষে একটু শান্ত হইয়া বলিল—লক্ষীটী, দুষ্টামি ছাড়ো, তোমার চাল থেকে চারটি আমাকে দাও।

হুপো কিছুক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করিয়া আপত্তি করিল, কিন্তু অবশেষে তাহাকে তিন মুঠি চাল দিল। মেয়েটি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

হুপো যে আনন্দ উপভোগ করিল, তাহারই চিন্তায় সে এমন মজিয়া গেল যে, সে অন্যমনস্ক হইয়া অসাবধান হইয়া পড়িল। সে রাস্তার মোড় যেই ঘুরিয়াছে, অমনই সে বুঝিতে পারিল যে, হঠাৎ একটা মুখখোলা ছালা তাহার মাথার উপর হইতে নামিয়া আসিতেছে। সে চীৎকার করিবার যে চেষ্টাটুকু করিল, কিন্তু তাহা একটা বলিষ্ঠ হাতের চাপে থামিয়া গেল এবং আরও বলবান্ তিন চারটা হাত তাহার কাঁধ ও গা চাপিয়া ধরিল ; নিমেষের মধ্যে তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তাহারা তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিল এবং তাহারা তাহাকে এমন বিধিমতে

সুসঙ্গতভাবে কিলাইতে লাগিল যে, দুপোঁ মারা পড়িবার ভয়ে মরার ভাণ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াই রহিল। তাহার আততায়ীরা তাহাকে তুলিয়া একটা দরজার গোড়ায় আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল এবং তাহার পরণের কোট-সার্ট, পাজামা, জুতা এবং অবশ্যই তাহার সঙ্গের সমস্ত রসদ কাড়িয়া লইল। তাহার পরে যখন তাহারা তাহার কাছে নোটের তাড়াগুলি পাইল, তখন তাহারা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল এবং বলিল—এইগুলা তুমিই রাখিয়া দাও, ইহা দিয়া তুমি একখানা খবরের কাগজ কিনিতে পারিবে। নোটগুলি ছাড়া তাহারা আর একটা জিনিস তাহার কাছে ছাড়িয়া গেল, তাহা তাহার মাথা-ঢাকা ছালাটা।

দুপোঁ যখন অনেক কষ্টে সেই ছালাটা হইতে তাহার মাথাটাকে মুক্ত করিয়া বাহির করিতে পারিল, তখন সে একাকী। বিস্তীর্ণ সহর তাহার বিরাট জঠরের মধ্যে ঐ চোরডাকাতগুলাকে গিলিয়া ফেলিয়াছে। দুপোঁ তাহার নোটগুলা ঐ ছালাটার মধ্যে ভরিয়া লইল—নয় নয়টা প্রকাণ্ড তাড়া—একুনে দশ লক্ষ টাকা। হয় তো উহা দিয়া একখানা খবরের কাগজ অপেক্ষা ভাল কোনও দ্রব্য কেনা সম্ভব হইলেও হইতে পারে—দু'বাটি চাল, কালকার আহারের মত। দুপোঁ সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়, তাহার টাকার থলী বগল-দাবায় লইয়া আর হাতে চাবি ধরিয়া নিজের ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি চলিল। কি দুর্দিনই আজ!

—শেষ—